কিতাবঃ ইসলামের মৌলিক চারটি বিষয়।
মূলঃ হাকিমুল উম্মাহ মুফতি ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)
Text Ready : মাঞ্জুর হোসাইন কাদেরী

প্রকাশকের কথাঃ

পবিত্র ইসলাম ধর্মে আল্লাহ, রসূল, নবী ও ঈমান এ চারটি মৌলিক বিষয়গুলো অতি গুরুত্ব সম্পন্ন। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, এগুলো আমাদের ধর্মের মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়। সাম্প্রতিককালে এ সমস্ত বিষয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস ও আকীদার পরিপন্থী। আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কিরাম মনে করেন যে রসূল ও নবীগণ আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন, যাকে শিরক মনে করা যায় না। কিন্তু মুখচেনা একটি দল এরূপ বিশ্বাসকে শিরক মনে করে। এ কারণে সমাজে অহেতুক কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ) এর বিরচিত “ইসলাম কি চার উসূলী ইসতেলাহী” গ্রন্থখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইটিতে উপরোক্ত মৌলিক বিষয়ে আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস ও আকীদা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তধারণা এ বইটির মাধ্যমে দূরীভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই বইটি প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। আশা করি সুধি পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হবে।

অবতারনিকাঃ

মুসলমানদের মধ্যে প্রায়শঃ দু'টি দল দেখা যায় একটি 'খাস' (অকৃত্রিম) অপরটি বাতিল" (কৃত্রিম) দল। খাস দলভুক্তদেরকে মুসলমান হিসেবে গন্য করা হয়, আর বাতিল দলভুক্তদেরকে কেবল নাম মাত্র মুসলিম শ্রেণী ভুক্ত ধারণা করা হয়। এ দু' দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। খাস দল মুসলমানদের বিশেষত্ব প্রধানতঃ তিনটি, তারা কোন কথা প্রতারণা মূলক বলেন না। তাই ইসলামে তাঁদের প্রতিটি বাক্যের মর্যাদা স্মরণীয় হয়ে আছে। আর বাতিল বা মুনাফেকদের অভ্যাস কৃত্রিমতায় আস্ছাদিত। মুখে তারা সুন্দর বুলি আওড়ায় বটে কিন্তু নিয়ত তাদের পাপাসকে ভরা। এ কারণে কুরআন-ই করীম তাদের ওসব কথাগুলো খনন করে এরশাদ করেছেন, মুনাফিকরা আপনার দরবারে এসে আরজ করে, نشهد انك لرسول الله আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসুল।” দেখুন, কতইনা সুন্দর কথা। কিন্তু মহান আল্লাহর তরফ থেকে এর বিপরীতে এরশাদ হয়েছে و نشهد ان المنافقين لكذبون . “আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুনাফিকরা মিথুক”। অন্য স্থানে এরশাদ হয়েছে, وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله" যদি তাদের কোন কার্জ শুভ হয় হয়, তখন মুনাফিক বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। দেখুন কতইনা সত্যি কথা। কিন্তু কুরআন-ই করীম তাদের এ বক্তব্যকে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত বলেছে। কেন? যেহেতু নিয়ত ছিল কপটতায় ভরপুর এবং প্রতারণা মুলক। তারা বলছে যে, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসুল শিকার করি। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে বলে, যা পূণ্য দিচ্ছেন, আল্লাহই দিচ্ছেন। হুযুরের বরকত এতে শামিল নেই। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তালার হামদ বা প্রশংসা যেভাবে করতো, হুযুরের প্রতি অবমাননাকর আচরণের প্রেক্ষিতেই প্রশংসা ছিল বিশুদ্ধ কুফরী। একই অবস্থা আধুনিক কালের মুনাফিকদের। অপকৌশল অবলম্বনে তৌহিদ, ইলাহ, ইবাদত, শিরক ও বেদআতের উপর তাদের অত্যাধিক চাপ। এদের উদ্দেশ্য কেবল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)থকে মুসলিম মিল্লাতকে সম্পর্কহীন করে দেয়া এবং তৌহিদের বাহানা করে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অপমান করা। আমি হালে একটি পুস্তিকা দেখেছি, নাম “ইসলাম কী চার বুনীয়াদি(ইসলামের চারটি বুণিয়াদী পরিভাষা)। ভীষণ আঘাত পেলাম। দেখলাম, রুপক ভাবে কৃত্রিমতার গভীর আশ্রয়ে পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শান, মর্যাদাকে শির্ক, কুফরী, বেদীনি বলা। তাই আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত আলহাজ্ব হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী ছাহেব কেবলার খেদমতে পুস্তিকাটির উপযুক্ত জবাব প্রদানের কথা ব্যক্ত করি। আমার পিতা (মঃ জিঃ আঃ) উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন মজলিসে তার অসাধারণ ঐশী পাণ্ডিত্য দিয়ে বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন। এতে সীমাহীন উপকার হলো। আমার ভাই মুফতি মোখতার সাহেব (দাঃ বঃ আঃ) ঐ সমস্ত বক্তব্য তার মাসিক পত্রিকা "আস্তানায় ফয়জে আলম” এ ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। আমার ইচ্ছা হলো, এ বিক্ষিপ্ত ফুল সমূহের একটি বাগান তৈরী করি এবং এ বিচ্ছিন্ন মণিমক্তা

সমূহের একটি হার মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে পেশ করি। মহান আল্লাহ পাক আমার উক্ত ইচ্ছাকে জান্নাতের ওসীলা করে দিন। * * * * **

(সাহেবজাদা মুফতি ইকঠিদার আহমদ খান)

অধ্যাপক, দারুল উলুম গাউছিয়া নঈমীয়া, গুজৱাট

লেখকের জীবনীঃ

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হাকিমুল উম্মত মুফতি আল্লামা আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দিতে শত শত নয়; বরং আপন জ্ঞান-গরিমা-পরহেজগারী, হিদায়েত, সর্বোপরি ন্যায় পরায়ন ভিত্তিক যে কয়জন ক্ষনজন্মা ইসলামী বীর মুজাহিদ ইহধাম ত্যাগ করেছেন, এদের মধ্যে হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা আলহাজ্ব শাহ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ুনী (রহঃ) এর ব্যক্তিত্ব অত্যাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এই মহান মনীষী স্মরণযোগ্য অসংখ্য অমূল্য কিতাব মহান ইসলামের খেদমতে রেখে যান। পাক বাংলা ভারত উপমহাদেশের আলেম ও বুদ্ধিজীবি সমাজে তার জ্ঞান গভীর, বিচক্ষণতা এবং বাগ্মীতা অবাধে স্বীকৃত। তার লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে এই কিতাবটি গবেষণামূলক। এতে ইলাহ, নবী রসুল, ঈমান ইত্যাদি বিষয়ের উপর অত্যন্ত উচ্চমানের আলোচনা করছেন এবং বাতিল আকিদা পোষণকারীদের ভুল যুক্তিসমূহ নিখুত ও সুন্দরভাবে খণ্ডন করেছেন এবং বিশুদ্ধ মত ও সঠিক দিকটা চিহ্নিত করতে সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হয়েছেন।

জন্ম ও বংশ ১৯০৬ ইংরেজী সন মোতাবেক ১৩২৪ হিজরীতে ইউ, পির বদাযুন জিলার অন্তর্গত উজানী নামক স্থানে তিনি শুভ জন্ম লাভ করেন। তাঁর বংশ ইউছুফ জী পাঠান বংশের সাথে সম্পর্কিত। তার পিতা মনোয়ার খান সাহেব ইবনে মোল্লা মুহাম্মদ ইয়ার খান সাহেব ছিলেন এলাকার একজন অতি সম্মানিত, দ্বীনদার এবং জমানার ছু ব্যক্তি।

মুফতি সাহেব তদীয় পিতা থেকে কুরআন, হাদীছ, দ্বীনিয়াত, ফার্সী ও দরসে নিজামীর উপর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর হযরত ছদরুল আফালি ফখরুল আমাছিল, যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (রহঃ) থেকে দ্বীনের পূর্ণ ইলম হাছেলে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি তার মোকাম্মেল হাতে বায়ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি হযরত শাহ মুহি উদ্দিন আশরফ প্রকাশ আষ্ঠী মিয়া (রহঃ) থেকে খিলাফত লাভ করেন। মুফতি সাহেবের জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দি কাল পাক-ভারতে সত্য প্রতিষ্ঠা ও বাতিল প্রতিরোধে অতিবাহিত হয়, যা তার দুর্লভ লিখনী সমূহে প্রতিভাত হয়েছে। ইলমূল মিরাছ (উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক পুস্তিকা) ব্যতীত মুফতি সাহেবের অন্য সব লিখা দারুল উলুম গাউছিয়া গুজরাট পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যেদুনা শাহ আহমদ রেজা খান (কুঃ সিঃ) এর পরে সংকলন ও রচনায় যেই প্রশংসনীয় খেদমত আনজাম দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। এ পর্যন্ত তার রচিত যে সমস্ত কিতাবাদির নাম জানা যায়, তা'হল (১) ইলমুল মিরাছ (২) শানে হাবীবুর রহমান (৩) জা আল হক দুখণ্ড (৪) সালতানাতে মোস্তফা (৫) রহমতে খোদা বা উছিলায় আওলিয়া (৬) বেছালায়ে নুর (৭) আমিরে মোয়াবিয়া পর এক মজর (৮) ইসলামী জিন্দেগী (৯) আলম আহকাম (১০) মওয়ায়েজে নঈমীয়া ৩ খণ্ড (১১) নয়ী তাকরিরী (১২) সফর নামা (ইরান, ইরাক, হেজাজ ইত্যাদি) (১৩) সফর নামা-১ (১৪) সফর নামা -২ (১৫) আল কালামুল মাকবুল পি তাহারাতে নাছবীর রসুল (১৬) ফতওয়ায়ে নঈমীয়া ১৭ খণ্ড (১৭) নঈমুল বারী ফি ইনশরাহিল বোখারী (১৮) নুরুল ইরফান ফি হাশীয়াতিল কোরান (১৯) তাফসীরে নঈমী (২০) মিরাতুল মুনাজিহ শরহে মিশকাতিল মাছাবিহ ৮ ঘণ্ড (২১) দরসে কুরআন (২২) ইলমুল কুরআন। এছাড়া তিনি অধিকাংশ পাঠ্য বইয়ের পাদটিকা লিখে গেছেন, যা অদ্যবধি অপ্রকাশিত।

ওফাত

অর্ধশতাব্দি পর্যন্ত ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষ লগ্নে মুফতি সাহেব রোগে আক্রান্ত হয়ে লাহোর হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি ৩রা রমজানুল মোবারক ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে অক্টোবর ১৯৭১ ইংরেজী গুজরাটে মহান প্রভুর সাক্ষাতে পরলোক গমন করেন। গুজরাটেই তিনি সমাধিস্থ হন। জীবদ্দশায় তিনি যে কামরায় দরসে কুরআন পেশ করতেন সেখানেই তার মাজার শরীফ অবস্থিত। আল্লাহ, তবারক ওয়াতায়ালা তাকে পরলৌকিক মহান নেয়ামত নছীব করুন। আমীন। আমার সাথে যারা আমীন বলবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত মঙ্গল পান করুন।

ইমানঃ

ঈমান শব্দটি আমন্ শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, শান্তি দেয়া এটি মহান প্রভূর একটি গুনবাচক নামও। এ কারণে তার পবিত্র নাম মুমিনও। অর্থাৎ আপন বান্দাদেরকে স্বীয় কহহর ও আযাব থেকে শান্তি ও পরিত্রান দানকারী। আর এটা বান্দার গুণও বটে। এ কারণে কুরআন করীম মুসলমানদেরকে মুমিন নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সঠিক আকিদা পোষণ করে নিজেকে আযাবে ইলাহী থেকে শান্তি বা মুক্তিদানকারী। শরীয়তের পরিভাষায় ঐ সব আকিদার নাম ঈমান, যা পোষণ করার কারণে মানুষ কুফরী থেকে রক্ষা পায় এবং মুমিনদের দলে অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়।

ঈমানের প্রাণ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর মধ্যে একটি অবয়ব ও একটি প্রাণ থাকে। আর প্রাণবিহীন অবয়ব মূল্যহীন। মানব দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ সে যাবতীয় সম্মানের যোগ্য থাকে। উন্নত খাবার, উত্তম পোষাক, মনোরম আট্টালিকা, মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব, রাজস্ব ইত্যাদি প্রাণ বিশিষ্ট দেহেই শোভনীয়। প্রাণ ত্যাগ করা মাত্রই জমিনে সমাধিত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজে আসে না। গাছপালা যতক্ষণ জীবিত থাকে; ততক্ষন তার মধ্যে তাজা ফল, ফুল সব কিছু থাকে। নির্জীব হওয়া মাত্রই চুলার ইন্দনে পরিণত হয়। বাল্ব, টিভি, ফ্যান ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম বৈদ্যুতিক পাওয়ার (শক্তি) প্রাপ্তিতে স্বক্রিয়। পাওয়ার ব্যতিরেকে একেবারে নিঃস্ক্রিয়। অনুরুপ ভাবে, নামায রোযা, হজ যাকাত, ঈমান প্রভৃতির অবয়ব ও প্রাণ আছে। জীবন বিশিষ্ট ইবাদত ও ঈমান আল্লাহর দরবারে সম্মানিত ও মূল্যায়িত। জীবনহীন নামায ঈমান প্রভৃতির না আছে সম্মান, না আছে মূল্য।

স্মরণ রাখুন, কলেমা পাঠ করা এবং ঈমানে মুজম্মাল ও মুফাচ্ছল, বর্ণিত বিষয়াদিকে মেনে নেয়া হলো ঈমানের অবয়ব। কিন্তু ঈমানের প্রাণ অন্য জিনিস আর তা হচ্ছে নাবুয়াতকে উলুহিয়াতের সাথে, আর নবীকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা। আল্লাহ ও রসুলের মাঝে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি করলে মানুষ কাফের হয়। আর পক্ষান্তরে আল্লাহকে রাসুলের সাথে সম্পর্কিত করলে মুমিন হয়। কুরআন করীমের ফতুয়া পর্যালোচনা করুনঃ

و يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكفرين عذابا مهينة.

(এবং তারা চায় যে, মহান আল্লাহ ও তার রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করে দিতে, আর বলে, আমরা কিয়দাংশের প্রতি ঈমান আনবো এবং তারা চায় যে, এরই মাঝে অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করতে। এ সমস্ত লোক জঘন্য কাফের আর আমি কাফেরদের জন্যে অপমান জনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।)

কুরআনে করীমের ফতওয়া দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে পার্থক্য মনে করা কুফর পক্ষান্তরে আল্লাহ ও রাসুলকে সম্পর্কিত করা ঈমান।

সম্পর্কিত করার মর্মার্থ

এ সম্পর্কিত করার মর্মার্থ এ নয় যে, রসুলকে খোদা মনে করা বা প্রভুকে রসুল ধারণা করা। আল্লাহ আল্লাহ, নবী নবীই। বরং সম্পর্কিত করার মর্মার্থ উদাহরণ স্বরুপ এভাবে বুঝে নিন যে, নোটের (টাকার) মধ্যে কাগজও আছে এবং সরকারী

মোহরও আছে। কিন্তু মোহর কাগজ নয়, কাগজ মোহর নয়। অথচ মোহর কাগজের সাথে এমন ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে যে, যদি কাগজ থেকে এটাকে পৃথক করা হয়; তাহলে কাগজ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। হারিকেনের চিম্নি স্বচ্ছ। তাই চিম্নির রং বাতির আলোর সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে যে, ঘরের যে কোনায় বাতির আলো আছে তথায় চিম্নির রং আছে। এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে বাতির আলো আছে কিন্তু চিম্নির রং নেই। কুরআন করীম বলেন-
مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى الزجاجه
(তার নূরের উদাহরণ হলো, একটি তাক, তার মধ্যে একটি বাতি, যে বাতিটি চিম্নির মধ্যে অবস্থিত।) | উক্ত আয়াতে করীমার বিভিন্ন তফসীর রয়েছে। যার মধ্যে একটি তফসীর এও আছে যে, তৌহিদে ইলাহী যেন একটি আলো। আর মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হলেন যেন একটি চিম্নি। ভেবে দেখুন, কলেমা তায়্যেবা হলো তৌহিদ। কিন্তু এতে তৌহিদের পরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রেছালতও উল্লেখ রয়েছে। শব্দ বিন্যাস দেখুন কলেমার প্রথমাংশ لا إله إلا الله (লাইলাহা ইল্লাল্লাহু) এর মধ্যে আল্লাহ শেষে রয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশ محمد رسول الله , (মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ) এর মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম প্রথমে। কিন্তু প্রথমাংশে لا إله إلا هو الله (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া) না দ্বিতীয়াংশে محمد رسول الله(রসুলুল্লাহে মুহাম্মদুন) লিখা হয়েছে। মুহাম্মদ, শব্দটি প্রথমে এসেছে। তা এ জন্য যে, যেন হুযুরের নাম আল্লাহর নামের সাথে মিলিত থাকে। যখন মহান আল্লাহ তার এবং তাঁর হাবীবের নামের পৃথকতা মেনে নেননি; তখন অন্যত্র তার এবং তাঁর হাবীবের মাঝে পার্থক্য কি করে পছন্দ করবেন? কুরআন করীমে অনেক স্থানে নিজের নামকে তাঁর হাবীবের নামের সাথে সংযোজন করেছেন। যেমন বলেন

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول _
(আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য স্বীকার করো)
و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما.(আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যারা আনুগত্য স্বীকার করে; তারা বড় বিজয়ী ।

و الله و رسوله احق ان يرضوه

(আল্লাহ ও তাঁর রসুল অত্যধিক হকদার। যে, তাঁকে রাজী করার)

اغناهم الله و رسوله من فضله

(আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা ধনী করে দিয়েছেন।

و من يخرج من بيته محاجرا إلى الله و رسوله

(যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি হিযরত করে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়েছেন)

و يرى الله عملكم ورسوله

(আল্লাহ ও তাঁর রসুল তোমাদের আমল দেখবেন।)

لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে এগিও না)।

فامنو بالله و رسوله

(আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আন)।

و لو أنهم رضوا ما اتاهم الله و رسوله

(যদি তারা এর উপর রাজী হয়, যা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল দান করেছেন।)

اذ تقول للذي انعم الله عليه و أنعمت عليه

(যখন আপনি তার সাথে বলতেন; যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি পুরস্কার দান করেছেন)।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট কবি হযরত হাচ্ছান ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ

ضم الاله اسم النبى باسمه – اذ قال في الخمس المؤذن أشهد

(মহান আল্লাহ তার নবীর নামকে তাঁর নামের সাথে সংযোজিত করেছেন; – পাঞ্জেগানা নামাজের তকবীর ও আযানে মুয়াজ্জিন ও মুকাব্বির আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতেই আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহও বলেন।)

. উল্লেখ্য যে, হযরত হাচ্ছান সেই ভাগ্যবান নাত পাঠকারী সাহাবী, যার এক একটি শের' এর উপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বার বার দোয়া করেছিলেন। তাঁর শের সমূহ নবী পাকের দরবার থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসার সনদ পত্র লাভ করেছেন। ইসলামিয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সহজে অনুমেয় যে, মহান আল্লাহ তার হাবীবের সুন্নাতকে আপন ফরয সমূহের সাথে এমন ভাবে সংশিষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন এবাদত সুন্নাত থেকে খালি নয়। পঞ্জেগানা নামাজে- জোহরের ফরয চার রাকাত, আগে পিছে 'সুন্নাত ছয় ছয় রাকাত। মগরীবের নামাজে ফরয তিন রাকাত, আর সুন্নাত ও নফল চার রাকাত, অতপর ফরয আদায় করতে গেলেও ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা পাঠ করা সুন্নাত, আউজুবিল্লা ও বিসমিল্লাহ পাঠ সুন্নাত, তারপর তেলাওয়াতে কুরআন করীম হচ্ছে ফরয, রুকু সিজদা ফরয, তার তাসবীহগুলো সুন্নাত। রমজানের রোযা ফরয, সেহরী, ইফতার, তারাবীহ সুন্নাত।

নিজ জীবনের দিকে দেখুন, শিশু ভূমিষ্ট হতেই কানে আযান দেয়া সুন্নাত, -আকীকা সুন্নাত, খতনা সুন্নাত, শিশু প্রতিপালন সুন্নাত। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ফরয জিম্মা শুরু হয়। আমরা সুন্নাতের ছত্রছায়ায় লালিত হই। যেমন জীবিকার্জন, বিয়ে-শাদী, স্ত্রীর বরণপোষণ সবই হচ্ছে সুন্নাত। মৃত্যু মুহূর্তে কলেমা পাঠ করানো, কেবলা মুখী করা সুন্নাত, গোসল ও দাফনের তরিকা সুন্নাত। বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রে ফরয সুন্নাত সমূহের সাথে মিলেই রয়েছে। একারণেই আমাদের নাম আহলে ফরয বা আহলে ওয়াজিব কিংবা আহলে মুস্তাহাব নয় বরং আহলে সুন্নাত। অর্থাৎ আজীবন সুন্নাতের ছত্র ছায়ায় জীবন অতিবাহিতকারী এবং কিয়ামত দিবসে সুন্নাতের ছত্রছায়ায় অবস্থানকারী। বস্তুতঃ রূহে ঈমান হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে সম্পর্কিত করা। শয়তান তথা হাজার রকমের কাফেরেরা আল্লাহর জাত (সত্বা ছিফাত (গুণাবলী) ফিরিস্তাকুল, জান্নাত দোযখ ইত্যাদি বিশ্বাস করে, কিন্তু তারপরও তারা কাফির। কেননা তারা আল্লাহ রসুলকে সম্পর্কিত করে না। " জনৈক আনছারী ফসলে পানি দেয়া নিয়ে এক মামলা নবী পাকের আদালতে পেশ করেন কিন্তু তিনি নবীর দেয়া রায়ের উপর সন্তুষ্ট হননি। তাই তার প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم محرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

(হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের কসম, এ ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ না সে তাদের মতানৈক্য বিষয়ে আপনাকে হাকিম স্বীকার করে এবং আপনার ফয়সালায় মনক্ষুন্ন হয় এবং অবনত মস্তকে গ্রহণ করে।)

কোন কোন সম্মানীত সাহাবীর আওয়াজ নবী পাকের দরবারে বড় হয়ে যেত।

তাঁদের প্রসঙ্গে এরশাদ হলো

يا أيها الين امنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت البين ولاتجهوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و انتم لا تشعرون.

হে মুমিনগণ! নবী পাকের আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ করোনা ।আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দরবারে এরূপ আওয়াজ বড় করো না, যেরূপ তোমারা পরস্পরের মধ্যে করে থাক। অন্যথায় তোমাদের নেক আমল সমূহ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, যাতে তোমাদের (সে ব্যাপারে) খবরও থাকবে না।

দেখুন, ঐ আনছারী আর উপরোক্ত আওয়াজ বুলন্দকারী সাহাবীদ্বয় কোন ঈমান আকীদার অস্বীকার করেন নি। তৌহিদ, কেয়ামত, ফিরিস্তা, বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদি স্বীকার করতেন। এমনকি তারা নবুয়তেরও কোন অস্বীকার করেননি। তবে নবুয়তের সম্মানে আবশ্যিক পালনীয় একটি বিষয়ে ক্রটি করে ফেলেছিলেন মাত্র। মহান প্রভু একেও কুফুরী ঘোষণা দিয়ে দিলেন। কেননা কুফরীর কারণেই নেকী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সার কথা হলো, এ সমস্ত আকীদা হচ্ছে, ঈমানের আদর্শ আর উভয় জাহানের সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রতি আদব ও সম্মান নিবেদন হলো ঈমানের রুহ বা প্রাণ।

একান্ত তাড়া হুড়ার সাথে এ সামান্য লিখা আল্লাহ ও রসুলের দরবারে উৎসর্গ। করলাম।
মহান মহিমাময় প্রভূ কবুল করুন-আমিন।

ওয়াসাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খায়রে খাকিহি ওয়া নূরে আরশিহি মুহাম্মদিন ওয়ালিহি ওয়া সাল্লিম।

ইলাহঃ

আধুনিক যুগের মানুষের মন নতুনত্বের প্রতি আসক্ত। প্রত্যেক জিনিসের আধুনিক ফ্যাশন আজ কালের অতি প্রিয়। কতেক আধুনিক ধোকাবাজ তৌহীদের অর্থও আধুনিক করে নিয়েছে। রিসালত, নবুয়্যত ও ঈমানের শরবতকে আধুনিক কৌশলে পাত্রস্থ করে ব্যবহারে মত্ত হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষের ঈমানে কাঁপন ধরেছে। কাজেই প্রয়োজন অনুভব করা হলো যে, মুসলিম মিল্লাতকে এ চার শব্দগুলোর ঐ পুরানো নিখুঁত অর্থ বাতলায়ে দেয়া যাক, যা চৌদ্দশত বছর থেকে মেনে আসা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, তৌহিদ এবং রেছালাত এমন মৌলিক আকিদা বা বিশ্বাস যার উপর ইসলামের মূলভিত্তি স্থাপিত। কালমা-ই- তায়্যেবা

لا اله الا الله محمد رسول الله

পড়ে সবাই ইসলাম ধর্মের মহান নেয়ামত ঈমান অর্জন করেন। কিন্তু আমাদের জানা দরকার اله"ইলাহ' অর্থ কি? এবং উলুহিয়াত বা আল্লাহর একত্ত্ববাদের পরিধি বা ভিত্তি কি জিনিসের উপর? উলুহিয়্যাত এবং আবদিয়াত (দাসত্ত) এর পৃথককারী জিনিসটি কি? এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। কিন্তু ইলাহ কি? সাধারণতঃ বলা হয়, যে, ইলাহ তিনিই যিনি গায়েব (অদৃশ্য) জানেন। ইলাহ তিনিই, যিনি মুশকিল কুশা (অসাধ্য সাধনকারী) হাজত রওয়াহ (মনবাসনা পূর্ণকারী) এবং অভিযোগ শ্রবণকারী, সাহায্যদাতা। ইলাহ তিনিই যিনি দূর থেকে শুনেন এবং দেখেন। এ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এ যে সাধারণত মুসলিম মিল্লাত, আম্বিয়া-ই কেরাম, আউলিয়ায়ে এজাম বিশেষ করে হুযুর সায়্যেদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানী, হাজির নাজির, অভিযোগ শ্রবণকারী, সাহায্যদাতা হিসেবে জানেন এবং বিশ্বাস করেন।ওদের মতে এরা সব মুশরীক, কেননা তারা বান্দাদেরকে ইলাহ মানছে।

আরবের মুশরীকগণ তাদের মুর্তিগুলোর (প্রতিমা) ব্যাপারে এ আকিদা রাখতো যে, এরা গায়ের (আদৃশ্য) জানে, প্রার্থনা কবুল করে ওরা মুশরীক ছিল। এ মুসলিমরাও নবী-ওলীগণের মধ্যে ক্ষমতা মেনে নিয়ে আরবের মুশরীকদের ন্যায় শির্কে গ্রেপ্তার হয়েছে। আমি দেখাচ্ছি যে, ইলাহ শব্দের এ অর্থ কোন মতে শুদ্ধ নয় এবং না এসব জিনিসের উপর উলুহিয়াত নির্ভরশীল। (যদি হয়) তাহলে কোরআনের আলোকে লক্ষাধিক ইলাহ মানতে হবে।

গায়েব জানা:-

যদি গায়েব জানা উলুহিয়াতের পরিধি বা ভিত্তি হয়, তবে পবিত্র কোরআন করীম হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে ফরমাচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাউম (গোত্র) কে এ বলে সম্বোধন করেন

و □نبئكم بما تـ□كلون و ما تدرون فى بيوتكم

"এবং আমি তোমাদের সংবাদ দিচ্ছি যে, যা কিছু তোমরা তোমাদের ঘরে খেয়ে থাক এবং অবশিষ্ট রাখ"।

স্মর্তব্য যে, تـ□كلون এবং تدخرون উভয় ক্রিয়াই মোযারে, যেখানে (ক্রিয়ায়) বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুইটিকাল নিহিত আছে। তবে এর অর্থ হবে এ যে, যা কিছু তোমরা আপন ঘরসমূহের রান্না ঘরে বসে খাইতেছ, কিংবা খাবে, অবশিষ্ট রাখতেছ কিংবা রাখবে, আমি সব কিছুর খবর তোমাদের দিতে পারবো। অর্থাৎ ক্ষেতসমূহে দানা বা বীজ, বাগান সমূহে ফল জন্মে, প্রত্যেক ফলের বীজের উপর ভক্ষনকারীর মোহর হয়। আমি ঐসব মোহর জানি এবং ভক্ষনকারীদেরও জানি। চিন্তা করুন তো, আল্লাহ তায়ালা ঈসা মছিহ আলাইহিস সালামকে কত ইলমে গায়েবের ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

যদি গায়েব জানা উলুহিয়াতের বৈশিষ্ট্য হয়, তবে কোরআনের আলোকে জনাব ঈসা মছিহ আলাইহিস সালাম ইলাহ্ হয়ে যাচ্ছে।

সৃষ্টিতে নির্দেশ জারী করা:-

যদি সৃষ্টিতে নির্দেশজারী করা এবং পানি, চাঁদ সূর্য উলুহিয়াতের কব্জায় হয়; তবে কোরআন মজিদের দৃষ্টিতে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে ইলাহ মানতে হবে। কারণ তাঁর (আলাইহিস সালাম) সম্বন্ধে কোরআন করীম বলেন-

و سخرنا له الريح تجرى بأمره رخاه حيث أصاب

অর্থাৎ তখন আমি তার অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে যেখানে ইচ্ছে সেথায় প্রবাহিত হতো। আরও বলা হয়েছে

له الريح عاصفة تجرى بأمره

অর্থাৎ আমি তাঁর অধীনে করেছিলাম তেজস্সী বায়ুকে, যা তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত হতো।

প্রতিয়মান হলো যে, আল্লাহতায়ালা প্রবল এবং স্বাভাবিক বায়ু সমূহকে (পূর্বের হোক কিংবা, পশ্চিমের, দক্ষিণের হোক কিংবা উত্তরের) হযরত সোলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর ফরমান পালনে বাধ্য করে দিয়েছেন। এটাও বুঝা গেল যে, বৃষ্টি দ্বারা (ফসল) উৎপাদন হয়, যার উপর তামাম জীবজন্তুর জীবন নির্ভরশীল। এ যুক্তির আলোকে সমস্ত সৃষ্টির রীতি-নীতি হক তায়ালা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এর নির্দেশাধীন করে দিয়েছেন।

উলুহিয়াতের এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকেও ইলাহ মানতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ মিন মিনহু।

আরোগ্য দান করা;

কোরআন করীম বলেন, হযরত ইউছুফ (আলাইহিস সালাম) তার মেহমান ভাইদের থেকে সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব(আলাইহিস সালাম) এর কুশল জিজ্ঞেস করেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইউছুফ (আলাইহিস সালাম) এর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করতে করতে দৃষ্টিশক্তি হারায়ে ফেলেছিলেন।

তাই তিনি বললেন

اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا

আমার এ কামিছ (জামা) টি নিয়ে যাও, আব্বাজানের চেহারার উপর আচ্ছাদান করবে, তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবেন।

কোরআন করীম হযরত আয়ুব (আলাইহিস সালাম) এর সম্বন্ধে বলেন

اركض برجلك هذا مغتسل بارض و شراب

অর্থাৎ আপন পাদ্বয় জমিনের উপর ঘর্ষণ কর, এতে সৃষ্ট পানি গোসলের জন্য এবং পান করার জন্যও। অর্থাৎ এতে আপনার জন্য জাহেরী বাতেনী শেফা বা আরোগ্য নিহিত রয়েছে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন-

ابرئ اكمه و الابرص و احى الموت باذن الله

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকদের ভাল করি এবং মৃতকে জিন্দা করি)

দেখুন শেফা দান করা, মৃতদের জীবন দান করা প্রতিপলকের কাজ

واذا مرضت فهو يشفين

(এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনি আরোগ্য দান করেন)এবং

يحيى و يميت

(তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেন)

কিন্তু ঐ সব আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দারা পরওয়ারেদেগারের অনুমতিক্রমে রোগ-ব্যাধি ভাল করেন এবং মৃতদের জীবন দান করে থাকেন।

কোরআন করিমের ঐ ঘটনাটাও স্মরণ রাখুন যে, চার জবেহকৃত কিমা তৈরী পাখি হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর আহবানে জীবিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যেমন

ثم ادعهن ياتينك سعيا

(অতঃপর তুমি এদের আহবান করলে, তারা তোমার নিকট জীবিত হয়ে দৌড়ে আসবে)

কিন্তু তা সত্বেও রব রবই রয়েছে, আর বান্দা বান্দাই। বান্দাদের হাতে রাব্বানী কার্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু বান্দা, বান্দাই রয়ে যায়। ইলাহ শব্দের উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আয়ুব আলাইহিস সালাম ও ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইলাহ হয়ে গেছেন।নাউযুবিল্লাহ।

সন্তান দান করাঃ

কোরআন করীম বলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর নিকট এমন অবস্থায় তশরীফ আনলেন, যখন তিনি পর্দা ডাকা জায়গায় গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। (মানব আকৃতিতে) তিনি তাঁকে দেখে ভয় পেলেন। তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সন্তানা দিয়ে বল্লেন

انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا

অর্থাৎ আমি তোমার প্রতিপালকের বার্তা বাহক, এ জন্যই এসেছি যে, তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান প্রদান করব।

দেখুন, ছেলে-মেয়ে দান করা প্রতিপালকের কাজ, যেমন মহান প্রভূ বলেন

يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الزكور

অর্থাৎ তিনি যাকে পছন্দ করেন, মেয়ে সন্তান দেন, এবং যাকে পছন্দ করেন ছেলে সন্তান দেন।

একই কথা প্রতিপালকের জন্যও বলা হয়েছে, এবং জনাব জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর জন্যও বলা হয়েছে। ক্রিয়া এক, অর্থও এক; কিন্তু না খোদা তায়ালা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হয়ে গেছেন আর না জিব্রাইল আলাইহিস সালাম খোদা হয়েছেন। যদি সন্তান দান করা উলুহিয়াতের দলিল (প্রমাণ) হয়; তাহলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামও ইলাহ হয়ে যেতেন। নাউযুবিল্লাহ।

দূর থেকে শুনা বা দেখা:

কোরআন করীম হযরত সোলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর সম্বন্ধে এরশাদ করেন- একদল পিপড়া জঙ্গলের মাঝে রাস্তা পারাপারে ছিল, তখন তিনি(আলাইহিস সালাম)শুনলেন, একটি পিপড়া তাঁর অনুসারী পিপড়াদের বলছিলো

« يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون

অর্থাৎ হে পিপড়াগণ! স্বীয় ঘর সমূহে ডুকে পড়, এমন না হয় যে, তেমাদের সোলাইমান(আলাইহিস সালাম) এর সৈন্যদল পদতলে পিষ্ট করে দেয় এবং তাদের খবর ও না হয়।

তিনি(আলাইহিস সালাম) পিপড়ার এ কথা শুনে হেসে উঠলেন। তফসীরকারকগণ বলেন, হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম পিপড়াটির এ আওয়াজ তিন মাইল দূর থেকে শুনেছিলেন। লক্ষ্য করুন, পিপড়ার আওয়াজ এত সুক্ষ্ম এবং মৃদ যে; আজকের বিজ্ঞানের যুগেও কোন যন্ত্র পিপঁড়ার এ আওয়াজ শুনতে সক্ষম নয়। এমন সুক্ষ্ম আওয়াজ তিন মাইল দূর থেকে শুনা, কতনা দুরের আওয়াজ শুনার সমান।

কোরঅন করীম বলছে, জোলাইখা হযরত ইউছুফ আলাইহিস সালামকে সপ্তদ্বার বিশিষ্ট প্রাসাদে নিয়ে যায়, এবং দ্বার সমূহ তালাবদ্ধ করে সে তাকে (আলাইহিস সালাম) আকর্ষণ করার চেষ্টা করল; কিন্তু এয়াকুব আলাইহিস সালাম এ সব ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি সুদূর কেনান নগরীতে বসে এ সব ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন এবং স্বীয় পুত্রকে তথায় গিয়ে সাহার্য করেন।

যেমন এরশাদ হচ্ছে

ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهن ربه

অর্থাৎ সে তখন আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন ইউছুফ (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি। তিনিও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন যদি না স্বীয় প্রতিপালকের বোরহান (দলিল) প্রত্যক্ষ করতেন।)

সেই বোরহানটি কি ছিলো? এয়াকুব আলাইহিস সালাম সামনে হাজির হওয়া এবং ইশারা ইঙ্গিতে ছেলে (ইউছুফ আলাইহিস সালাম) কে নিষেধ করা। স্মর্তব্য যে, এখানে راى ক্রিয়া বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, সেই বোরহানটি প্রত্যক্ষকৃত ছিলো, আওয়াজ ছিলনা।

কোরআন নবী আলাইহিস সালামকে প্রত্যক্ষকৃত বোরহান বলেছেন।যেমন

يا ايها اناس قد جاءكم برهان من ربكم

(অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পক্ষ হতে বোরহান বা দলিল আর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তশরীফ এনেছেন)

- দেখুন এয়াকুব আলাইহিস সালাম অজ্ঞাত প্রাসাদে স্বীয় সন্তানের অবস্থা দেখে নিলেন। কোরআন করীম আরও বলেন-

و لما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف

যখন কাফেলা ইউছুফ আলাইহিস সালাম এর কামিছ (জামা) নিয়ে মিসর এলাকা ত্যাগ করলো; তখন এয়াকুব আলাইহিস সালাম কেনানে বসে বলছিলেন যে, আমি ইউছুফ আলাইহিস সালাম এর সুঘ্রান পাচ্ছি।

চিন্তা করুন, কোথায় মিশর আফ্রিকার রাজধানী এবং কোথায় কেনান শাম রাজ্যের একটা অঞ্চল। এতদূর থেকে তিনি ইউছুফ আলাইহিস সালাম এর কামিছের সুঘ্রান পেলেন। যদি দূর থেকে দেখা, শুনা, ও গন্ধ পাওয়া উলুহিয়াতের পরিধি হয়, তাহলে হযরত এয়াকুব আলাইহিস সালাম এবং সোলাইমান আলাইহিস সালামও ইলাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।নাউযুবিল্লাহ

হাজির নাজিরঃ

যদি প্রত্যেক জায়গায় হাজের অর্থাৎ বিরাজমান হওয়া এবং প্রত্যেক জায়গা হাতের তালুর ন্যায় দেখা, উলুহিয়াতের দলিল হয়, তাহলে এক, দুই নয়, বরং লক্ষাদিক ইলাহ মেনে নেয়া বাধ্য হয়ে পড়বে।

যেমন কোরআন করীম বলেন,আসফ বিন বরখিয়া হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম সমীপে আরজ করলেন

قال انا اتيك به ان يرتد اليك طرفك

অর্থাৎ আমি আপনার খেদমতে বিলকিসের সিংহাসন আপনার চোখের পলক মারার আগেই উপস্থিত করবো। স্মর্তব্য যে, বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামন রাজ্যের সাবা' নামক শহরে বিলকিসের প্রাসাদে তালাবদ্ধ আছে। আর তিনি আছেন ফিলিস্তিনে। কারো থেকে সেই শহরের রাস্তা জিজ্ঞেস করলেন না, আসা-যাওয়ার জন্য কোন গাড়ীও সাথে নিলেন না, আর পলকের পূর্বেই এত ওজনী সিংহাসন বহন করে হযরত সোলাইমান (আলাইহিস সালাম এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। এটা হচ্ছে, বনী ইস্রাইলের একজন ওলীর সর্বত্র উপস্থিত হওয়ার প্রমাণ।

কোরআন করীম আরও বলেন

قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم

অথাৎ তোমাদের সবাইকে মৃত্যু দান করে মৃত্যুর ফেরেস্তা, যাকে তোমাদের উপর নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যত্র বলেন- وتوفتهم رسلنا অর্থাৎ তাদের সবাইকে আমার ফেরেস্তারা ওফাত (মৃত্যু) দান করে। অর্থাৎ মালাকুল মাউত এর সাহার্য্যকারী।

দেখুন হযরত মালাকুল মাউত এবং তার সহযোগী ফেরেস্তারা এক মুহূর্তে সহস্র স্থানে হাজার হাজার মৃত্যুবরণকারীর প্রাণ বাহির করে নেয়। অর্থাৎ তোমরা যেখানে থাক না কেন, তাদের সামনে থাকবে, এবং সর্বত্র তাদের হাত পৌছে থাকে।

আরও বলা হয়েছে

انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

অর্থাৎ সেই ইবলিস এবং তার গোষ্ঠী ও বংশধররা তোমাদের সবাইকে ওখান থেকে দেখে থাকে, যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না।

বুঝা গেল যে, ঐ সব বেঈমান লোকদের পরিচালিত করার জন্য এত শক্তি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে যে, একই মুহূর্তে সমস্ত মানবজাতিকে দেখে থাকে ও তাদের বিপদাপদ এবং মনবাসনা সমূহ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এ জন্যই যখন কোন ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা কিংবা মনস্থির করে, তখনই সে তাকে (বিপথে পরিচালিত করে। চাঁদ-সুরজ, তারোকারাজি সর্বত্র বিরাজমান সর্বত্রই একই সময় দেখা যায় এবং সর্বত্রই স্বীয় আলো দান করে, ফসলাদি বিকশিত করে, নাপাক স্থলকে শুকায়ে পবিত্র করে। যদি হাজের নাজের হওয়া উলুহিয়াতের পরিধি হয়, তবে হযরত মালাকুল মাউত এবং তাঁর সমস্ত সহযোগী ফেরেস্তারা ইলাহ হয়ে যাবে, শয়তান এবং তার সমস্ত বংশধর ইলাহ হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সুরজ ও সমস্ত

তারকা রাজিকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করতে হবে। হিন্দুরা তো দশ-বিশটি ইলাহ মানে, কিন্তু এ সব তৌহিদীদের ইলাহ হিন্দুদের চাইতে বেশী হয়ে যাবে।

“অসুবিধা বিদূরণকারী, হাজত পূর্ণকারী, সাহার্যদাতা হওয়া"

এসব বিষয় সমূহও উলুহিয়াতের পরিধি নয়। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের এবং তাদের তবরুক সমূহকে এর ক্ষমতা দান করেছেন। যেমন কোরআন করীম বলেন, জনাবা মরয়ম (আলাইহিস সালাম) এর প্রসববেদনা যখন শুরু হলো, তিনি (তখন) জঙ্গলে একাকী ছিলেন, যেখানে তাঁর নিকট না ছিলো বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, না ছিলো ধাত্রী। এর পূর্বে কখনো এ কষ্ট দেখেননি ও অনুভবও করেননি।

তাই তিনি ভীত হয়ে বললেন-

ياليتنى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا

অর্থাৎ হায়! আমি এর পূর্বেই যদি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যেতাম।

এ আরজীতে মহান বিধাতার রহমতের সাগর উতলে উঠলো এবং আরজী কবুল হলো

فناداها من تحتها ان لا تحزنى قد جعل ربى تحتك سريا

অর্থাৎ নীচ থেকে আওয়াজ আসলো, হে, মরয়ম! ভয় করো না, তোমার প্রভু তোমার কদমের নীচে একটা শীতল পানির প্রস্রবণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। تحتك শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে,এ প্রস্রবণ জনাবা মরয়ম (আলাইহিস সালাম) এর কদম শরীফের উসিলায় উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন জমজমের পানি জনাব ঈসমাইল আলাইহিস সালাম এর পায়ের গোড়ালি শরীফের আঘাত দ্বারা প্রবাহিত হয়েছিলো।

وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

(এবং খেজুরের দন্ড যা শুকিয়ে গেছে, নীচের দিকে আন্দোলিত কর, তা অকস্মাৎ পাকা খেজুর ফলাবে।)

ঐ খেজুর সমূহ খেয়ে এ পানি পান করে নাও। তোমার বিপদ সহজ হয়ে যাবে এবং সহজেই সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত মরয়ম (আলাইহিস সালাম) এর বিপদ বিদূরণ অল্প খেজুর এবং পানি দ্বারা করা হয়েছে। কিন্তু সেই খেজুর তার হাত থেকে এবং পানি তাঁর পা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে যে, ওলীর হাত লাগার দরুন শুকনা খেজুরের ডালি তৎক্ষণাৎ সবুজ বর্ণ হয়ে ফল ফলাতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ পাকিয়ে দিতে পারে এবং এ ফল দ্বারা সমস্ত বিপদ আপদ সহজ হয়ে যেতে পারে। অতএব যদি আমাদের মৃত আত্মা সমূহের উপর কোন ওলীর সুদৃষ্টি পড়ে, তবে এ আত্মা তরতাজা হয়ে মারফতের ফল-ফুল দিতে পারে এবং এর দ্বারা সমস্ত বিপদ-আপদ সহজ হয়ে যেতে পারে।'

কোরআন মজীদ আরও বলেন, ফেরাউন নিমজ্জিত হওয়ার দিন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম একটি ঘোড়ার আরোহী ছিলেন। এ ঘোড়ার খুরের আঘাতে মরু ভূমি অঞ্চলে উদ্ভিদ সষ্টি হয়েছিল। যাদুকর সামরী (হযরত মুছা আলাইহিস সালাম

এর সম সাময়িক বিখ্যাত যাদুকর) ঐ ঘোড়ার খুরের নিছের কিছু মাটি নিয়ে নিল। যখন মুছা আলাইহিস সালাম তৌরাত কিতাব গ্রহণ করার জন্য তুর পাহাড়ে তশরীফ নিলেন এবং সেখানে কিছু দেরী হল, তখন সামরী' সোনা দিয়ে একটি গো বাচুর তৈরী করে তার মুখে এ মাটি ঢেলে দেয়, ফলে তা জিন্দা প্রাণী হয়ে চিক্কার করতে শুরু করলো, এবং ঈসরাইলীরা একে পুজা করতে লাগলো।

যেমন বলা হচ্ছে

فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و كذالك سولت لى نفسى অর্থাৎ আমি হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর ঘোড়ার কদমের চিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম, তা আমি এ প্রাণীর মুখে ঢেলে দিই, আমার অন্তর ইহা বলেছিলো। এ আয়াত এ কথাই বলছে যে, "প্রভূর নৈকট্য প্রাপ্তদের তবরুক সমূহ জীবনহীনকে জীবিত করতে পারে। এ সম্বন্ধে মূলতঃ কিছু রহস্য রয়েছে যে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম লেগেছিল কাষ্ঠের সাথে, সেটা লেগেছিলো ঘোড়ার পিঠের সাথে, ঘোড়ার খুর লেগেছিল মাটির সাথে,সেই মাটি মূর্তির মুখে পৌছে একে জীবন দান করল। মাটিতো তার স্বীয় কার্য সম্পাদন করেছে; কিন্তু সোনা ছিল বাস্তবিক পক্ষে ফেরাউনীদের। এ কারণে এর আওয়াজ দ্বারা মানবতার হেদায়াত হয়নি বরং গোমরাহ হয়েছে, যেমন বে-দ্বীন আলেমের ওয়াজ দ্বারা মানুষ গোমরাহ হয়ে থাকে। এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মদিনা মনোয়ারার মাটি মুছিবত বিদূরণকারী এবং আরোগ্যেদানকারী। এ জন্যেই ইহাকে 'খাকে শেফা' (আরোগ্যের মাটি) বলা হয়। কারণ এখানকার মাটির অনুসমূহ জনাবে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জুতো মোবারক চুমো খেয়ে ছিল।অতএব, যদি মছিবত বিদূরণ করা উলুহিয়াতের পরিধি হয়!

তবে জনাব মিরয়ম (আলাইহিস সালাম) এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামও ইলাহ হওয়া উচিত।

এমনকি চিকিৎসকদের শিরাব, মদক, বড়ি সমূহ, জঙ্গলের (গাছের) মূল ইত্যাদি ইলাহ হয়ে যাবে। শরবতে ফরয়াদরস, হুবে মিসকীন-ই- নওয়াজ, হুবে শেফা, হুবে দাফেয়ে ফরযে কুশা খুলিয়া ইত্যাদি সব ইলাহ হয়ে গেছে- নাউযুবিল্লাহ মিনহা।

সৃষ্টিকর্তা, মালিক, ও চিরস্থায়ী হওয়াঃসৃষ্টি কর্তা, মালিক ও চিরস্তায়ী হওয়া-

এ সমস্ত বিষয়াদিও উলুহিয়াতের পরিধি নয়।কেননা যখন কোন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, তার মালিকত্ব গুনটাও প্রকাশ পায়নি; তখনও তিনি ইলাহ্ ছিলেন। জান্নাত এবং ওখানকার নেয়ামত সমূহ জান্নাতি লোক, এভাবে দোযখ সমূহ, ওখানকার আযাব, এবং দোযখীরা তথায় পৌছে সবাই চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। যেমন মহান প্রভূ বলেন- اكلها دائم

তার ফল সর্বদা বিদ্ধমান আছে,

خالدين فيها ابدا

জান্নাতী ও জাহান্নামীরা তথায় স্ব স্ব স্থানে সর্বদা থাকবে।

তবে এ থেকে অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, প্রত্যেক জান্নাতী ও দোযখী ইলাহ হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

একটি ঘটনা

বর্তমান যুগের একজন একেশ্বরবাদী আলেম কোন এক স্থানে ওয়াজ করার উদ্দেশ্যে তশরীফ নিলেন এবং ওয়াজের মধ্যে কলেমা'ই তায়্যেবা' এর অর্থ এমনি করলেন- নেই কোন সন্তানদাতা, নেই কোন রক্ষক, নেই কোন অসুবিধা বিদূরণ কারী, নেই কোন হাজতপূর্ণকারী আল্লাহই একমাত্র। ঘটনাক্রমে মাহফিল আয়োজনকারী সুন্নী ছিলেন। তাঁর এ ওয়াজে দাওয়াতকারী মর্মাহত এবং আশ্চার্যান্বিত হলেন। পরদিন সকালে মৌলভী সাহেবকে নজরানা (টাকা পয়সা) দেয়ার জন্য -

আসলেন না। শেষ পর্যন্ত মৌলভী বাধ্য হয়ে মাহফিল আয়োজনকারীর নিকট এসে নজরানা প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি বললেন মৌলভী সাহেব রাতের ওয়াজ কি ভুলে গেছেন, প্রত্যুষেই কি শির্কে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। لا اله নেই কোন ভাড়া , প্রদানকারী,لا اله নেই কোন নজরদাতা،الا الله একমাত্র আল্লাহই।

আপনি আমার কাছে কেন নজরানা প্রার্থনা করছেন? প্রভূর নিকট আবেদন করুন।

যাই হোক, ইলাহ শব্দের এ অর্থ এবং উল্লেখিত বিষয়াদি উলুহিয়াতের পরিধি . হওয়াটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

উলুহিয়্যাত ও ইলাহ এর ইসলামী অর্থঃ

আল্লাহ তায়ালা আদি, চিরন্তন, শ্রবণকারী, দ্রষ্টা, হাজতপূর্ণকারী, বিপদ বিদূরণকারী, সৃষ্টি কর্তা, মালিক, রক্ষক, শেফা ও রুজী দাতা। কিন্তু এ সব কিছুর মধ্যে ইলাহ, আবূদ (বান্দা) এবং মাবুদের (উপাস্য) মধ্যে ভিন্নতা ছাড়া কোন বক্তব্য নেই।যে জিনিস বান্দা এবং ইলাহ' এর মধ্যে পার্থক্য করতঃ যেই ভিত্তির উপর বান্দা বান্দা থাকে এবং ইলাহ্ ইলাহ থাকে, তা হচ্ছে এক জিনিস অর্থাৎ ধনী আর বেনিয়াজী (পরমুখী না হওয়া)। বান্দা হচ্ছে সে-ই,যে অপরের মুখাপেক্ষী হয়। তার রশি অন্য কারো হাতে থাকে এবং সে নিজেই অন্যের অধীনে থাকে।

ইলাহ হচ্ছে তিনিই, যিনি কোন কিছুর হাজত প্রার্থী, ও আবেদন প্রার্থী নয়, সবার চাইতে ধনী এবং প্রয়োজনমুক্ত। দেখুন সুরা এখলাছে প্রথমে বলা হয়েছে الله الصمد

অর্থাৎ "আল্লাহ পর মুখাপেক্ষী নন" ।

এটা হচ্ছে তার বে-নিয়াজীর প্রমাণ

যেমন বলা হয়েছে,

لم يلد و لم يولد

"না সে কারো পিতা না কারো সন্তান"।

কেননা পিতৃত্ব এবং পুত্রত্ব আবেদন প্রার্থনার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। অতঃপর শেষান্তে এরশাদ হয়েছে :

و لم يكن له كفوا أحد

অর্থাৎ" তার কোন সমকক্ষ নাই" । কেননা সবাই তাহার মুখাপেক্ষী। আর তিনি সবার হাজতপূর্ণকারী। এবং বলা হচ্ছে

والله غني عن العالمين

অর্থাৎ" আল্লাহ সৃষ্টি জগত থেকে বে-পরওয়া এবং বে-নিয়ার্জ" ।আরও বলা হয়েছে

والله غني و انتم الفقراء

"আল্লাহ বেনিয়াজ, তোমার তার ফকির ও নিয়াজ প্রার্থী"।

আরো বলা হয়েছে

ولم يتخذ وليا من الذل

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপারগতা ও হাজত প্রার্থীর ভিত্তিতে কাউকে নিজ অভিভাবক বানাননি"। এবং বলেন و لم يعى بخلقهن

অর্থাৎ" আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করে দুর্বলতা অনুভব করেনি" এবং দুর্বল হয়ে কারো নিয়াজ প্রার্থী হয়নি।

এটা হচ্ছে সেই কষ্টি পাথর, যার ভিত্তিতে বান্দা বান্দা থাকে, আর প্রভূ প্রভূই।

কোরআন হাকীম বলেন والله سميع بصير

" আল্লাহ দ্রষ্টা ও শ্রবণকারী" এবং অন্যত্র বলেছেন আমি মানবজাতিকে শ্রবণকারী এবং দ্রষ্টা বানায়েছি। আল্লাহ জিন্দা, বান্দাও জিন্দা, কিন্তু

তারপরও আল্লাহ ইলাহ এবং বান্দা বান্দা কেন?

এ জন্যই যে, আল্লাহ বে-নিয়াজ হয়ে। শ্রবণকারী, দ্রষ্টা, জিন্দা, চিরস্থায়ী, মালিক এবং রাজা।

আর বান্দা, প্রভূর হাজত প্রার্থী এবং তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে জিন্দা, শ্রবণকারী, দ্রষ্টা, মালিক এবং রাজা। এসব গুণাগুণ বান্দাকে প্রভূ প্রদান করেছেন এবং যখন ইচ্ছা করেন তা তাদের থেকে চিনিয়ে নেয়।

জরুরী টীকা

:ছুফি সাধকগণের পরিভাষায় চিরস্থায়ীত্ব হচ্ছে বেলায়তের একটি স্তর। এ স্তরে পৌছলে বান্দাকে কায়উম (স্থায়ী) বলা হয়। এ জন্যেই মোজাদ্দেদীয়া খান্দানের বুজুর্গানের কিতাবসমূহে কতেক অলি আল্লাহগণকে কায়উমে আউয়াল, (প্রথম কায়উম) কায়উমে ছানী (দ্বিতীয় কায়উম) বলা হয়েছে। হাদীছ শরীফে এর প্রতি ইশারা মওজুদ আছে

بهم يمطرون وبهم يرزقون

এভাবে আল্লাহ তায়ালা রক্ষক, হাজত পূর্ণকারী, বিপদ বিদুরণকারী এবং শেফা, আওলাদ প্রদানকারী এবং কতেক: বান্দারাও তাঁর দান ও ইচ্ছাক্রমে রক্ষক, বিপদ বিদূরণকারী এবং আওলাদ প্রদানকারী হয়। সে সম্বন্ধীয় আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বান্দা বান্দাই, প্রভূ প্রভূই। আল্লাহর এ সমস্ত গুণাগুণ বে-নিয়াজ ও ধনী হওয়ার ভিত্তিতে, আর বান্দাদের এ গুণাগুণ তার হাজত প্রার্থী ও নিয়াজ প্রার্থীর ভিত্তিকে। কারণ তাদের এ সব গুণাগুণ মহান প্রভূ দান করেছেন এবং তারা খোদ এবং এসব গুণাগুণ প্রভুর সষ্টি ও কুদরতের নিয়ন্ত্রনাধীন। আল্লাহর ধনীত্ব ও বে-নিয়াজী সত্বাগত এবং হাকিকী (প্রকৃতগত) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আর বান্দার ক্ষেত্রে রূপক ও দানকৃত হিসেবে ব্যাখা করা হয়। এ হলো উলুহিয়াত ও আবদিয়াতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইঞ্জিন এবং রেলের সমস্ত বগি সমূহ একই লাইনের উপর একই গতিতে দৌড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন যে, যা দৌড়ছে তা হচ্ছে বগি,আর দৌড়াচ্ছে ইঞ্জিন; যা মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে বগি আর যার প্রতি মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে ইঞ্জিন।

আয়নায় সূর্যের ছায়া এসেছে, ফলে আয়নায় আলোর প্রতিবিম্বতায় উত্তপ্ত অর্থাৎ সূর্যের সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এতে অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা জানেন যে, সূর্য সূর্যই, আর আয়না আয়নাই। সূর্য আয়নায় আসেনি, আর আয়না সূর্য পর্যন্ত পৌছেনি। আয়নার মালিককে আয়নাতে দেখা যাচ্ছে, তার শরীর সমস্ত অংশ সমূহ রং সৌন্দর্য

পোশাক-পরিচ্ছেদ নড়া চড়া ইত্যাদি আয়নায় দেখা যায়। সে আঙ্গুলী নাড়াচাড়া করছে আয়নায়ও প্রতিচ্ছবি নড়ছে। কিন্তু মূল মূলই আর ছায়া, ছায়াই । এখানেও ধনী : মোহতাজ, হাকিকত-মজাজ, সত্বাগত ও প্রদত্ত এর পার্থক্য রয়েছে। জনৈক ছুফি কি সুন্দর বলেছেন :

عارف خدا نما است دے اونه می شود

آئنه رو نما است دلے رونه می شود

অর্থাৎ "আরিফ, (যিনি খোদা চিনতে সক্ষম হয়েছেন) খোদার পরিচয় দানকারীও বটে,তবে আরিফ খোদা হয়ে যায় না। আয়না চেহারা দেখায় কিন্তু সে চেহারা হয়ে যায় না" ।এখন সেই হাদিসে কুদসীটি দেখুন।

فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه

মহান প্রভূ বলেন, বান্দা যখন আমার অতি নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তার জবান হয়ে যাই, যদ্বারা সে কথা-বার্তা বলে,'আমি তাঁর হাত হয়ে যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই,যদ্বারা সেচলা-ফেরা করে, তার চক্ষু হয়ে যাই, যদ্বারা সে প্রত্যক্ষ করে, তাঁর কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শ্রবণ করে। এখানে একাকার বা অনুপ্রবেশ নয়। বরং রাব্বানী তাজাল্লী যখন বান্দারউপর পতিত হয় তখন বান্দার থেকে খোদায়ী কাজ প্রকাশিত হতে থাকে।

একটি সন্দেহঃ

আমার উপরোক্ত বক্তব্যের উপর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে একটা সন্দেহ হতে পারে। তা এ যে, যদি উলুহিয়াতের পরিধি ধনীত্ব আর আবদিয়াতের (দাসত্বের) পরিধি মুখাপেক্ষী হয়, এবং ইলাহ যদি সেই যিনি বেনিয়াজ আর বান্দা সে, যে নিয়াজ প্রার্থী হয়, তাহলে আরবের মুশরিকগণ মুশরিক না হওয়া দরকার ছিলো এবং না তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে ইলাহ বলা উচিৎ ছিল। অথচ কোরআন করীম তাদেরকে ইলাহ বলছে। আর তাদের পূজারীদেরকে মুশরিক বলেছে। কেননা, কোন মুশরিক স্বীয় উপাস্যদেরকে ঐশ্বর্যশালী এবং বে-নিয়াজ স্বীকার করে না। যেমন তাদের আকিদা ছিলো আমাদের মাবুদ (উপাস্য) আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রতি হাজত প্রার্থী। কোরানে হাকীম বলছে- যদি তোমারা ঐ সব মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আসমান জমিন কার? তারা বলবে আল্লাহর । যদি তাদেরকে বলা হয় তোমাদেরকে জীবিকা কে দেন? বলবে আল্লাহ। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় আসমান জমিনের বাদশাহী কার অধিকারে? তারা বলবে আল্লাহর।হাদিস সমূহ দ্বারাও প্রমাণিত যে, আরবের মুশরিকগণ যখন হজ্ব অথবা উমরার ইহরাম বাঁধতো, তারা তলবীয়ায় এ শব্দসমূহ ও বলতো

لاشريك لك الأ شريكا واحدا هو عبد لك

অর্থাৎ "হে প্রভূ! তোমার কোন শরীক নেই এক ব্যতিত, এবং সেই শরীকও তোমার বান্দা"

এসব কথা সত্ত্বেও তারা স্বীয় মূর্তিদেরকে ইলাহ বলে আর কোরআন করীম তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা করেছে।

এখন চিন্তা করা দরকার যে, সেটা কি আকিদা ছিলো, এবং কাফিররা তাদের মূর্তিদের সম্বন্ধে কি আকিদা রাখতো, যাদেরকে তারা ইলাহ মানতো এবং তাদের খোদার শরীক জানতো। সেটা শুধু এ আকিদা ছিলো যে, আমাদের মাবুদ সমূহ অদৃশ্যজ্ঞানী, সর্বত্র বিরাজমান, দূর নিকট থেকে দ্রষ্টা ও শ্রবণকারী, আমাদের হাজত পূর্ণকারী, বিপদ বিদূরণকারী, ফরিয়াদ গ্রহণকারী। এসব আকিদার কারণে তারা মুশরিক হয়েছে। কারণ এসব গুণাগুণ উলুহিয়াত্যেপরিধিভূক্ত।যে বান্দার মধ্যে এ সব গুণাগুণ মানা যায়, তাকে আল্লাহ স্বীকার করা হলো। মুশরিকগণ এসব গুণাগুণ স্বীয় দেবতাদের মধ্যে স্বীকার করে মুশরিক হয়েছে এবং আজকের মুসলমানরা নবী ওলীদের মধ্যে এসব গুণাগুণ স্বীকার করে মুশরিক হয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ সব মুসলমানরা স্বীয় পীর এবং ওলীদেরকে ইলাহ মানছে।

টীকাঃ

বিরুদ্ধবাদীদের এটা হচ্ছে চূড়ান্ত দলিল, যার উপর ভিত্তি করে তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে মুশরিক বলছে।

এ সন্দেহের অবসানঃ

শিরক হচ্ছে কাউকে আল্লাহর বরাবর স্বীকার করা।

কোরআন করীম ইরশাদ ফরমান

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

("অতঃপর কাফিরগণ বান্দাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সর্মকক্ষ করে দেয়") আরও ইরশাদ হচ্ছে কিয়ামত দিবসে কাফিরগণ স্বীয় উপাস্যদের বলবে যে, আমরা অতি পথভ্রষ্ট ছিলাম। কেননা আমরা তোমাদেরকে রাব্বল আলামিনের সমকক্ষ জানতাম।

اذ نسويكم برب العالمين

বুঝা গেল যে, শিরক হচ্ছে কোন বান্দাকে প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করা।

প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করাটা দুইভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ বান্দাকে এতটুকু উচ্চ মনে করা অর্থাৎ তার প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থান দেয়া, আল্লাহর ন্যায় সত্বাগত ভাবে সৃষ্টিকর্তা, মালিক, অদৃশ্যজ্ঞানী, রক্ষক ইত্যাদি হিসেবে মেনে নেয়া। দ্বিতীয়তঃ মহান প্রভূর শান ক্ষুন্ন করে তাকে স্বীয় বান্দাদের কাতারে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এটা স্বীকার করা যে, কিছু জিনিসের জন্য বান্দারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী আর কিছু জিনিসের জন্য মহান প্রভূ বান্দার মুখাপেক্ষী। এই দুই অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহ স্বীকার করা হচ্ছে।

আরবের কাফিরগণ এ দুই প্রকারের শিরকে লিপ্ত ছিলো।কাফিরদের একাংশ ফেরেস্তাদেরকে খোদার পুত্র, আর একাংশ স্বীয় দেবতাদেরকে খোদার কন্যা মানতো, একাংশ স্বীয় দেবতাদেরকে খোদার পুত্র মানতো। উল্লেখ্য যে, পিতা-পুত্র পরস্পরের মধ্যে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী হয় “জাতিগত সমকক্ষ”

এ আকিদার কারণে ঐ লোকেরা মুশরিক হয়েছে। তাদের খণ্ডন কোরআন করীমের অনেক আয়াত বিদ্যমান,

যেমন মহান প্রভূ বলেন

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

"না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন, না তিনি কাহারো থেকে জন্ম হয়েছেন। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই" । আরও বলা হয়েছে

و جعلوا بينه وبين الجنة نسبا।

আরবের |´ সাধারণ মুশরিকদের আকিদা ছিলো যে আমাদের মূর্তি ও উপাস্যরা আল্লাহর বান্দা বটে,কিন্তু মহান প্রভূ তাদের মুখাপেক্ষী। প্রভূ পৃথিবী সৃষ্টি করে এত বেশী দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, তিনি এখন দুনিয়া পরিচালনা ও ইন্তেজাম নিজ আয়ত্বাধীন রাখতে অক্ষম। আমাদের এসব মাবুদরা দুনিয়া পরিচালনা করছেন এবং এখানকার কাজকর্ম চালাচ্ছেন। এ আকিদা হচ্ছে শিরক। কারণ এখানে বান্দাদেরকে প্রভূর সমকক্ষ স্বীকার করা হয়েছে। কারণ বান্দাদেরকে প্রভূর প্রতি এবং প্রভূকে বান্দার প্রতি নির্ভরশীল বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাদের খন্ডনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

মহান প্রভূ বলেন

وما مسنا من لغوب

“জগত সৃষ্টির বেলায় আমার একটুও দূর্বলতা অনুভব হয়নি"। আল্লাহ তা'য়ালা এসব বস্তুকে পয়দা করে ক্লান্ত হননি।

অন্যত্র বলা হয়েছে।

ولم يتخذ وليا من الذل

“আল্লাহর তায়ালা অসহায় ও দুর্বল হিসেবে কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেননি" ।

মোট কথা, তাদের এ আকিদা ছিল শিরক। কাফিরদের একাংশ পৃথিবীর জন্য দুইজন স্বাধীন খোদা, স্রষ্টা ও মালিক মানতো। তারা বলতো যে, ভাল এবং খারাপের স্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার। ভাল কাজের স্রষ্টার নাম “ইযদানী” বলতো আর খারাপের স্রষ্টার নাম বলতো “আহরে মন"। তারা তাদের কতেক কাল্পনিক বান্দাকে খুবই উচ্চস্তরে স্থান দিয়ে খোদা মেনে নিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ!কোন মুসলমান এ রকম জঘন্য আকিদা রাখে না।শুধু কোন বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ব ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোন মাহবুব বান্দাকে সৃষ্টির রক্ষক, বিপদ বিদূরণকারী মনে করা না শিরক, না কুফর। আরবের মুশরিকগণ এ সমস্ত আকিদার জন্য মুশরিক হয়নি বরং মুশরিকে পরিণত হয়েছে ঐ আকিদার কারণে, যা আমি কোরআন করিমের আলোকে বর্ণনা করেছি।

ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের হাজপূর্ণকারী,বিপদবিদূরনকারী ও রক্ষক মনে করতেন। যখন তাদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হতো, তখন প্রিয় নবীর পবিত্রতম বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে আরজ করতো

طهرنى يا رسول الله
অর্থাৎ" হুজুর আমাকে পবিত্র করুন" ।

একথা বলবেইতো। কেননা যেখানে স্বয়ং মহান প্রভূ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলছেন : 'আমার মাহবুব তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত অর্থাৎ কোরআন ও হাদিছ শিক্ষা দেন।

আর বলছেন

হে মাহবুব! তাদের ছদকা সমূহ উশুল করুণ এবং ছদকার মাধ্যমে তাদের জাহেরী বাতেনী পরিষ্কার করুণ, এবং তাদের জন্য রহমতর প্রার্থনা করুন, (কেননা) আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের আত্মার প্রশান্তি।

এ সব আয়াত থেকে প্রতিয়মান হলো যে, শুধু কোরআন, হাদিছ, নামাজ, রোজা ইত্যাদি আমাদের পাক এবং পরিষ্কার করতে পারেন না, যতক্ষণ না জনাবে মোস্তফা " (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সুদৃষ্টি না হয়। কোরআন হাদিছ রুহানী সাবান ও পানি স্বরুপ। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দয়া ও রক্ষণাবেক্ষন, এবং রুহানী সাহায্যই হচ্ছে পাক করার হাত। শুধু সাবান ও পানি কারো হাত লাগা ব্যতিত কাপড়কে পরিষ্কার ও পাক করে না। অন্ধরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরানাপন্ন হয়ে চক্ষু প্রার্থনা করেছে। মৃগরোগীরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করেছে, শুকনো কাষ্ঠ, পাথর সমূহ হুজুর (সাল্লাল্লাহু। আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আশ্রয় নিয়েছে। সায়্যেদেনা রাবিয়া ইবনে কা'ব (রাঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে জান্নাত প্রার্থনা করেছিলেন।

যেমন

মুসলিম শরীফে আছে اسئلك موافقتك في الجنة "হুজুর,আমি আপনার কাছে এটাই প্রার্থনা করছি যে, যেন আমি জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে পারি" ।

অর্থাৎ ঈমান, আমল, শেষ ভাল, কবরের পরীক্ষায় কামেয়াবী, কঠিন হাশরের নাজাত, পুলছিরাত পারাপার, জান্নাতে প্রবেশ, হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নৈকট্যতা ইত্যাদিই প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু উভয় জগতের শাহীনশাহ্ এ কথা বলেননি যে, এটা আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আমি কিভাবে দিতে পারি বরং বলেছেন এ ব্যতিত কি আরও কিছু প্রার্থনা করার আছে? আরজ করলেন এটাই হচ্ছে আমার বাসনা। বুঝা গেল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চাহিদা পূর্ণ করে থাকে। যদি কোন বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ব ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা,বিচারক ও রক্ষক মনে করা, বিপদ বিদূরণকারী, হাজতপূর্ণকারী মনে করা শিরক হয়; তবে ছাহাবা কেরাম সবাই মুশরিক হয়ে যায়, নাউযুবিল্লাহ।

আশ্চায্যের বিষয় যে, হযরত আম্বিয়া-ই কেরামের ইলমে গায়েব, মশকিলকুশা, হাজত রাওয়া হওয়া এমন সুস্পষ্ট মাসআলা যে, যাকে এ যুগের কাফিররাও অস্বীকার করতে পারে না।

কোরআন করিম বলে যে, যখন ফিরাউন এবং তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর আযাব আসতো, তখন তারা পালিয়ে গিয়ে হযরত মুছা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম এর বারগাহে উপস্থিত হয়ে অরজ করতো

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن و لمرسلن معك

অর্থাৎ" হে মুছা! (আলাইহিস সালাম) যদি এবার আপনি এ আযাব আমাদের থেকে দূর করে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো, এবং আপনার সাথে বনি ঈসরাইলকে পাঠিয়ে দেব" । মহান প্রভূ ও মুছা কলিমুল্লাহ তাদের এ ফরিয়াদকে শিরক বলে ঘোষনা দেননি বরঞ্চ মুছা আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন এবং মহান প্রভূ সেই আযাব তুলে নিতেন।

পুনরায় এসব লোকেরা বিশ্বাস ঘাতকতা করতো। ফলে তাদের উপর দ্বিতীয়বার আযাব আসততা, প্রভূ নিজেই বলেছেন:

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

"যখন আমি তাদের থেকে আযাব তুলে নিতাম, তখন তারা পুনরায় ফিরে যেতো" । যদি তাদের এ কাজ শিরক হতো, তাহলে তাদের উপর আযাব বেশী হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ যুগের কিছু সংখ্যাক কলেমা পড়ুয়া ঐ সব লোকদের চাইতেও মুর্খ ।

আল্লাহ সবাই কে বুঝতে সাহায্য কর। আমীন।

নবীঃ

এ শব্দটা نبأ (সংবাদ) শব্দের ছিফত্ মুশাববাহ। এর অর্থ, সংবাদদাতা। যেমন- করিম মানে অনুগ্রহকারী, রহিম মানে দয়ালু, হুছাইন মানে সৌন্দর্যের অধিকারী। তদ্রুপ নবী মানে সংবাদদাতা। এরূপ সংবাদদাতা হওয়ার মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে। যথাঃ সংবাদ দানকারী, সংবাদ সংগ্রহকারী, সংবাদ সংরক্ষণকারী। نبئ (নবী) এর অর্থ যদি খরবদানকারী হয়; তখন একান্ত জিজ্ঞাস্য মাসআলা এটা হবে যে,কি ধরণের এবং কোথাকার খরবদানকারী?

পত্র-পত্রিকা, বেতার যন্ত্র, খাম (এনভেলপ) তারবার্তা, টেলিফোন, ইত্যাদি সহ বি, বি, সি'র সংবাদ বিভাগ, সবই সংবাদদানকারী। কিন্তু তাদেরকে নবী বলা হয় না। যদি বলেন, হারাম হালালের সংবাদদাতা এবং শরীয়তের মাসআলা মাসায়েলের বর্ণনাকারী হচ্ছে নবী, তাহলে প্রত্যেক আলেম, প্রত্যেক মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), মুজতাহিদ এ সব খবরাদি দিয়ে থাকেন, কিন্তু এদেরকে নবী বলা হয় না।

যাহোক এমন কোন বিশেষ খবর হতে হবে, যার পরিবেশনকারী-কে নবী আখ্যায়িত করা হয়। কাজেই পূর্ণ বিশ্লেষণ হচ্ছে,পৃথিবী বাসীকে পৃথিবীর সংবাদ দানকারী, তথা আলমে শুহুরের খবরাখবর বর্ণনাকারী হচ্ছে পত্র-পত্রিকা বা তারবার্তা, কিতাব কিংবা গবেষণা দ্বারা মাসআলা বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলেম, কিংবা মুজতাহিদ। কিন্তু পরশ (পৃথিবী) বাসীদেরকে আরশের সংবাদদাতা, আলিমে গায়ব (অদৃশ্য জগতের) এর খবরাখবর বর্ণাকারী হচ্ছেন, নবী। যেখানকার খবরা-খবর আদান-প্রদানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমূহ অকেজো, সেখানকার খবরা খবর দানকারী হলেন নবী।

যারা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করে, মূলতঃ তারা তাঁর নবুয়তেরই অস্বীকারকারী। আর যারা বলে যে, নবী কেবল শরীয়তের মাসআলা সমূহ জানেন, এবং পৃথিবীবাসীদেরকে কেবল তা-ই-জানানোর জন্য আগমন করে থাকেন, তারা নবী আর মুজতাহিদের মধ্যে কি বা পার্থক্য করবে? আমি আপনাদেরকে কয়েকটি হাদীছের বর্ণনা শুনাচ্ছি, যদ্বারা প্রতিভাত হবে যে, নবী কোথাকার খবরদাতা।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হযরত যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বিষন্ন মন নিয়ে বসা ছিলেন। প্রশ্ন করা হল, হে জাবির, কি খবর এতো বিষন্ন কেন? আরজ করলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদ প্রান্তে শহীদ হন। তাঁর বিদায়কালে কয়েকজন কন্যা ও কর্জ রেখে যান। অর্থাৎ তার বিচ্ছেদ বেদনা,নিজ বোনদের ও কর্জের চিন্তা সবই আমার মধ্যে একত্রিত হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন, তোমাকে কি কিছু বলবো, যদ্বারা তোমার বিষন্নতা দূরীভূত হয়ে যাবে। আরজ করলেন, হুযুর নিশ্চয় বলবেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন অদ্যাবধি মহান প্রভূ কারো সাথে পর্দাবিহীন অবস্থায় কালাম করেন নি। তোমার পিতাই প্রথম মৃতজন, যার সাথে তার প্রভূ পর্দাবিহীন অবস্থায় কালাম করেছেন।হযরত জাবিরের আগ্রহ হলো সেই কালামটি শুনার জন্য। হুযুর বললেন, প্রভু তোমার পিতাকে এরশাদ করেন, কিছু কামনা করো। তোমার পিতা আরজ করেন,হে মাওলা! তুমি মাকে সব কিছু দান করেছ; কি জিনিসের আরজু করবো? বললেন,অবশ্যই কিছু করো। আরজ করলো, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো

হোক। অতপর ঐ উহুদ ময়দানের ন্যায় যেন পাথরী জমি হয়। এভাবে যেন রক্তে স্নান করি, এবং তোমার পথে যেন শহীদ হই। তোমার পথে শহীদ হয়ে যে মজা পেয়েছি, তা অন্য কিছুতে নাই। তখন প্রভূ বললেন, আমার এটা নিয়ম নয় যে, কাউকে পরীক্ষা করিয়ে কিংবা পাশ করিয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা।

অনুরূপ, এক মহিলা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলো- হে আল্লাহর রসুল! আমার একমাত্র জোয়ান পুত্র আপনার সাথে জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়েছে, সে যদি বেহেস্তি হয়, তবে আমি ছবর করবো, কিন্তু এর বিপরীত হলে আমি এমনভাবে কান্না কাটি করবো, যা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বললেন, আল্লাহর তৈরীকৃত জান্নাতের স্তর আটটি, তোমার ছেলে জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর- ফেরদাউসে রয়েছে।

এক ব্যক্তিকে প্রিয়নবীর জীবদ্দশায় শাস্তি স্বরূপ পাথর নিক্ষেপ করা হয়। অন্য কোন এক ব্যক্তি, তার প্রতি পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে অপরাধী হিসেবে মনে করলো। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওকে মন্দ বলতেছ, অথচ সে বেহেস্তের ঝর্ণাধারা সমূহে মহাতৃপ্তিতে বিচরণ করতেছে।

দেখুন! প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মদিনার জমিনে তশরীফ থাকাবস্থায় কোথাকার খবর দিচ্ছেন। ওটা ওখানকার খবর যেখানে খবর আদানপ্রদানের সমস্ত মাধ্যমসমূহ অকেজো।

কিন্তু প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে এটা বলেননি যে, আমি মদিনায় রয়েছি আর এ সব শহীদগণতো অদৃশ্য জগতে পৌছে গিয়েছেন, আমার কাছে তথাকার কি বা খবর থাকবে। না একথা বলছেন যে, আচ্ছা, জিব্রাইল আমিন আসা পর্যন্ত একটু সময় দাও, তার থেকে জিজ্ঞেস করে বলবো, বরং চিন্তা ভাবনা ব্যতিরেকে প্রশ্ন শুনা মাত্রই এরশাদ করে দিলেন। উপরন্তু সাহাবা-ই- কেরামের এ ধরনের প্রশ্ন প্রিয় নবীর দরবারে পেশ করা, এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা এ আকিদাই পোষণ করতেন যে, নবী হন তিনিই, যিনি অদৃশ্য জগতের খবরা খবর দেন। আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তাঁদের পেশকৃত প্রশ্নের সন্তোষজনক জওয়াব দেয়া মানে উক্ত আকিদার অনুমোদন করা।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর নবুয়তকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দানের কথা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। স্বয়ং খোদাতায়ালা বলেন- و علم ادم الاسماء كلها

আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম কে প্রত্যেক ছোট-বড়, মান-সম্মানী আ'লা-আদনা বস্তু সমূহ শিক্ষা দান করেছেন। শুধুমাত্র শিক্ষাই দেননি বরং অনু থেকে পাহাড়, বিন্দু থেকে সিন্দু, ভূমন্ডল থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত যা হয়েছে, আর যা হবে সব কিছুই শিক্ষা দান করেছেন। (তাফসীরে জালালাইন ইত্যাদি) উপরন্তু ভূমণ্ডল থেকে নভোমণ্ডল পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তু তাঁর দৃষ্টি গোচরীত করেছেন।

প্রতিয়মান হলো যে, নবী বলতেই অদৃশ্য জগতের খবরদাতাকে বুঝায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের (সম্প্রদায়) সামনে স্বীয় নবুয়তকে অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান ও ইলমের খাযানা বলে প্রমান করেন। যেমন বলেছেন,

وأنبئكم بما تاكلون وماتدرون في بيوتكم

তোমাদেরকে খবর দিতে পারি, যা তোমরা নিজ ঘরে আহার কর, এবং অবশিষ্ট রাখ)।

نبي (নবী) শব্দটা দেখুন, আর انبئكم (উনাব্বেউকুম) শব্দটা দেখুন, উভয় শব্দ একই মূল থেকে উৎপত্তি। স্মরণ থাকা চাই যে,تاكلون হচ্ছে 'মোজারে' এর সিগা, যার মধ্যে বর্তমান-ভবিষ্যৎ উভয়টা অন্তর্নিহিত। যদি এর শুরুতে س(সিন) সংযোজিত হয়, তাহলে ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন سيقول السفهاء আর যদি ل (লাম) সংযোজিত হয়, তাহলে বর্তমানকালের অর্থ জ্ঞাপক হয়। যেমনঃ لتمرون عليهم (আল কুরআন) আর যদি সিন বা লাম কোনটা ন থাকে, তাহলে বর্তমান ভবিষ্যৎ উভয় অর্থ বুঝায় যেমন, تاكلون-تدخرون

যেহেতু এখানেও উভয় ক্রিয়া ل (লাম) ও س (সীন) বিহীন সেহেতু উক্ত ক্রিয়াদ্বয়ের অর্থ সাধারণভাবে এ হতে পারে যে, আমি তোমাদেরকে খবর দিতে সক্ষম।যে, যা কিছু তোমরা আহার কর, আর মৃত্যু অবধি পর্যন্ত খেতে থাকবে আর যা কিছু অবশিষ্ট রাখবে। অর্থাৎ ক্ষেতের উৎপাদিত ফসলের প্রত্যেক দানা, বাগান সমূহের প্রত্যেক ফল, পানির প্রতিটি ফোটা সম্পর্কে আমার জ্ঞান রয়েছে। এ আহার কে খাবে বা পান করবে, এটা হচ্ছে, নবীর তত্বাবধানে। অর্থাৎ নবীর শান হচ্ছে তিনি যেমন স্রষ্টার জ্ঞান রাখেন, তেমনি সৃষ্টিরও। সৃষ্টির মধ্যে নভোমণ্ডল সমূহেরও জ্ঞান রাখেন এবং ভূমণ্ডল তথা ভূমণ্ডলীর বস্তু সমূহেরও। যেমন, যোগ্য ডাক্তার রোগীর শরীরের উপর হাত রেখে রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারে, তদ্রুপ আমাদের নবীর হাত মোবারকও প্রত্যেকের জ্ঞান ও ঈমানের উপর। এ আলোকে কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করছি।

মিশকাত শরীফে সায়্যিদেনা ওমর (রাঃ) এর প্রশংসা শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত, একদা বিশ্বকুল সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)'র নিকটে তশরীফ আনেন। তখন রাত্র ছিল। আকাশ পরিষ্কার, তারকারাজি ঝলমল করছিল। হযরত উম্মুল মোমেনীন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমন কোন ব্যক্তি কি আছে, যার নেকী তারকারাজির সমতুল্য। চিন্তা করুন, কতনা গুরুত্ববহ প্রশ্ন। কেননা, তারকা বিভিন্ন আসমানে বিদ্যমান, প্রথম থেকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মধ্যে অনেক এমন ক্ষুদ্র তারকাও রয়েছে, যা অধ্যাবধি পর্যন্ত দৃষ্টির মধ্যে আসেনি। আবার অনেক এমনও রয়েছে, যা সূর্যের কিরণের কারণে দৃষ্টিগোচরীত হয় না, কিন্তু আকাশে বিচরণ করে।তদ্রুপ, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের নেকী সমূহ হবে বিভিন্ন প্রকারের কিছু গর্তসমূহে, কিছু পাহাড় সমূহে, কিছু অন্ধকার রজনীতে, কিছু দিবালোকে, কিছু নির্জনে, কিছু সমাবেশে। মোটকথা এ প্রশ্নটা আরশ ও পরশ সম্পর্কিত। আরও উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত বিষয় দুইটির বড় ছোট বা সমতার কথা তিনিই বলতে পারেন, যার সম্মুখে উক্ত দুই বিষয় উপস্থিত থাকে এবং তাঁর দৃষ্টি উক্ত দুইয়ের কনা-অনুকনার উপর প্রসারিত থাকে। প্রতিয়মান হলো যে, উম্মুল মোমেনীনের আকিদা তা-ই ছিল ।

.

عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر

আরশের উপর তোমার চলন - পরশের উপর তোমার নজর (দৃষ্টি)

ملکوت و ملک میں کوئی شئی نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

আত্মা ও রাজ্যে এমন কিছু নেই যা তোমার সামনে অস্পষ্ট।

এর উত্তরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এটা বলেননি যে, ওহে আয়েশা! তোমার মত আমিও মদীনার জমিনে অবস্থিত। আমি কি জানি কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত কি রকম হবে, কত পরিমাণ নেকী করবে এবং কোন আকাশে কত পরিমাণ তারকা রয়েছে। তুমি আমার কাছে রোযা নামাজ সম্পর্কিত মছায়েল জিজ্ঞেলা করতে পার। না এটা বলেছেন যে, জিব্রাইল আমিন আসুক, তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নেয়া হবে। না এটা বলেছেন যে, খাতা-কলম নাও হিসাব করে দেখি, না একথা বলেছেন যে, একটু অপেক্ষা কর চিন্তা করে দেখি, বরং বিনা চিন্তায় সাথে সাথেই বলে দিলেন যে, হ্যাঁ একজন লোক আছে, যার নেকী আকাশের তারকারাজির সমান। আর তিনি হলেন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। উম্মুল মোমেনীন আরজ করলেনঃ আমার পিতা ছিদ্দিকে আকবরের কি অবস্থা? বললেন, হিজরতের রাতে তাঁর সেই খেদমত। ফারুকে আজমের জিন্দেগীর নেকীর চাইতেও উত্তম। প্রতিয়মান হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতের প্রত্যেকের নেকী সম্পর্কে অবহিত। তিনি হলেন সর্বজ্ঞাত নবী।

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে “সাহমে গারব” নামক অধ্যায়ে আছে যে, বদর যুদ্ধে হযরত হারেজ আততায়ীর তীরের আঘাতে শহীদ হন, তাঁর মা দরবারে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার সন্তান যদি জান্নাতে হয়, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি, অন্যথায় আমার সন্তানের জন্য আমি এমনভাবে ক্রন্দন করব, যাতে মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হয়। এ ক্ষেত্রেও নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ রূপ বলেননি যে, মা! আমার নিকট খবর কিসের, যেথায় তুমি সেতায় আমি। আর না এ রকম বলেছেন যে জিব্রাইল আমিনকে আসতে দিন; তার থেকে জিজ্ঞেস করে বলবো। বরং বললেন, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে জান্নাত আটটি। তম্মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। তোমার সন্তান সেথায় আছে।

ও মিশকাত শরীফের কিতাবুল যাকাতে ছদকার ফযিলত শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত, উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, একদা তার পবিত্র বিবিগণ প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)'র দরবারে আরজ করলেন

ايها اول لحو قابك يا رسول الله

হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মধ্যে সবার আগে কে আপনার সাথে মিলিত হবে? বললেন اطو لكن يد (তোমাদের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট মহিলাটি আমার সাথে প্রথম সাক্ষাত লাভ করবে) আমরা নিজেদের হাত পরিমাপ করলাম। তাতে বিবি সওদার হাত সবার চাইতে লম্বা ছিল। কিন্তু পরে প্রতিয়মান হলো যে, লম্বা হাত মানে দান খয়রাতকারী। কারণ সবার আগে বিবি জয়নবের ওফাত হয়, যিনি সবার চেয়ে অধিক দান ছদকা করতেন। গভীরভাবে চিন্তা করুন, এ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কতইনা বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যেকের ওফাতের সময়, কখন কার ইন্তেকাল হবে, মৃত্যুর অবস্থা, আমাদের সবার মৃত্যু ঈমানের উপর হবে কিনা, মরনোত্তর নিজেদের অর্থাৎ আমরা কোথায় থাকবো, আপনার সাথে, না অন্যত্র। কেননা তারা আরজ করছিলেন যে, আমাদের মধ্যে সবার আগে আপনার সাথে কে সাক্ষাৎ লাভ করবে। এখানেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলেননি যে, এসব হচ্ছে পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞান, আমি কি করে জানাবো, না এ রকম বলেছেন, জিব্রাইল আমিন থেকে জিজ্ঞেস করে বলবো। বরং তৎক্ষনাৎ উত্তর দিয়ে দিলেন।

বুখারী শরীফের পবিত্রতা অর্জন বিষয়ক আলোচনায় “প্রশ্রাব থেকে বেঁচে থাকা” শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একটি স্থান অতিক্রম করার সময়,দুইটি কবরের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- এ কবরদ্বয়ে নিতান্ত সাধারণ গুনাহের কারণে আযাব হচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন ছোগলখোরী করতেন, আর দ্বিতীয় জন উট ছড়াতেন, উঠের প্রস্রাব থেকে দূরে সরে থাকতেন না। অতপর একটি তাজা ডালিকে দ্বিখণ্ডিত করত:এক এক করে দুই কবরে পুতে দিলেন এবং বললেন, যতক্ষন পর্যন্ত এই ডালি তাজা থাকবে, ততক্ষন তাদের তাসবীহ পাঠের কারণে কবরদ্বয়ে আযাব হালকা হবে। এ হাদিস থেকে কয়েকটি মসায়েল বোধগম্য হয়ঃ

(১) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টি শক্তির সামনে কোন মাটি আড়াল হতে পারে না। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য একই সমান দেখেন। লক্ষ্য করুণ, আযাব হচ্ছে হাজার মন মাটির নীচে জমিনের মধ্যে। আর এদিকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জমিনের উপর থেকে সেই আযাবকে প্রত্যক্ষ করলেন। সুবহানাল্লাহ।

(২) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকের প্রতিটি নেকী ও গুণাহ সম্পর্কে খবর রাখেন। লক্ষ্য করুণ, উক্ত কবরবাসীদ্বয় নিজেদের জীবদ্দশায় ছোগলখোরী করতো, প্রস্রাবের চিঠকা থেকে পরহেয করতো না। উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যক্তিরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এসব কাজ করেনি। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তাদের খবরাখবর ছিল। বুঝা গেল যে, প্রত্যেকের প্রতিটি আমল সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খবর রাখেন। তাই তিনি সংবাদ প্রদানকারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।"

কবরের উপর সবুজ ঘাস লাগানো, তাজা ডালি, ফুল ইত্যাদি রাখা এ হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত। এর ফলে কবরের আযাব হালকা হয়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায়, কবরে, হাশরে তথা সকল সমস্যায় উম্মতের সাহায্য করেন, খবরা খবর রাখেন। কিয়ামত দিবসে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সবার আগে মখলুকের খবর নেবেন। অতঃপর হিসাব

নিকাশ আরম্ভ হবে। কিয়ামতের সূচনা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহায্য দ্বারাই আরম্ভ হবে।যেমন বুখারী, মুসলিম প্রমূখ গ্রন্থের হাদিস সমূহে বর্ণিত আছে।

রহস্যঃ কিয়ামতের সমাবেশে শাফায়াতকারীর সন্ধানী মুহাদ্দিছ মুফাচ্ছির, উলামা, ফকিহ, আওলিয়া, ছুফি গাউছ-কুতুব সবাই হবেন। কিন্তু কারো স্মরণ হবে না। যে, আজ কেবল প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মস্তকেই শাফায়াতের মুকুট। অথচ পৃথিবীতে তাদের আকিদা ছিল যে শাফায়াতের দরজা কেবল হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খুলবেন। কিন্তু তারা তখন এমন ভাবে ভুলে বসবেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম কারো স্মরণ আসবে না। নিছক নিজেদের কিয়াস দ্বারা অপরাপর সম্মানিত নবীদের নিকট শাফায়াতের জন্যে ধর্ণা দিবেন এবং ওনারাও হুযুরের পরিচয় দান করতে পারবেন না। ধারণা করে হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মুছা আলাইহিস সালাম প্রমুখের ঠিকানা বলবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যতীত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম কেউ বলতে পারবেনা। এর মধ্যে কি রহস্য? রহস্য হচ্ছে মখলুক যদি প্রথমেই হুযুর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমীপে হাজির হতেন এবং হুযুর এদের জন্য শাফায়াত করে দেন, তখন কেউ কেউ হয়তো বলবে এ শাফায়াতে হুযুরের কিসের বিশেষত্ব? আমরা ঘটনাক্রমে এখানে এসে পড়লাম এবং শাফায়াত হয়ে গেল । যদি অন্য কোন নবীর নিকট যেতাম তখনও শাফায়াত হয়ে যেত। প্রত্যেকের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য প্রথমে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ফিরাবেন। প্রত্যেকের দ্বারে ভিক্ষা করাবেন। এবং সবার দ্বারা স্বীকার করায়ে নেবেন যে, আজ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত সাহায্যকারী নবী অন্য কেউ নাই। সাহাবায়ে কেরাম সব সমস্যার সমাধানের জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরই আস্তানায় হাজির হতেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি হচ্ছে না, ইয়া রাসূল আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আজ অত্যাধিক বৃষ্টি হয়ে গেল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি গুনাহ করে এসেছি। এমনকি, মক্কার কাফেরেরাও সমস্যা সমাধানে দোয়া করানোর জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরই দরবারে আসতো, জীব-জন্তু পর্যন্ত নিজেদের দুঃখ দুর্দশা হুযুরেরই পবিত্র খেদমতে আরজ করতো।

জীব-জন্তু, গাছ-পালা, ইট-পাথর সবই জানে যে, এই নবীই হলেন আমাদের সাহায্যকারী। কেননা ফরিয়াদ বা প্রার্থনা তারই সামনে করা হয়, যিনি সবকিছুর খবর রাখেন।

আল্লাহ সবাই কে বুঝতে সহায়তা কর। আমীন।

রাসুলঃ

কালেমা-ই-তাইয়্যেবা' এর দুটি অংশ, (যথা) لا اله الا الله আর محمد رسول الله “ইলাহ” এর অর্থ এবং যে জিনিসের উপর উলুহিয়াতের স্থিতি, তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখণ গবেষণার বিষয় হচ্ছে রাসুল'কে হয়ে থাকেন আর রেসালতের অর্থ কি? রেসালত এর স্থিতি কোন জিনিসের উপর?

স্মরণ রাখা দরকার যে, রেসালত এর অর্থ প্রেরণ করা, “বেয়েছত” এর অর্থও প্রেরণ করা। কিন্তু এতে পার্থক্য হচ্ছে “বায়াছ” সাধারণ প্রেরণকে বলা হয় কিন্তু রেসালত বলা হয় কিছু প্রদান পূর্বক প্রেরণ করাকে। যেমন কারো নিকট প্রেরণ করা আর কিছু প্রদান করার জন্য প্রেরণ করা। কাজেই, রেসালত বেয়েছত অপেক্ষা খাস এবং এ জন্যেই আমরা সাধারণ জনগণ রসূল না। “রসুল” এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে সংবাদ বাহক ও ফয়েজ বাহক। আবার রসুল দুই প্রকারের যথাঃ “বে-ইখতিয়ার রসুল” (ক্ষমতাহীন রসুল) এবং “বা-ইখতিয়ার রসুল” (ক্ষমাতাবান রসুল) বেইখতিয়ার রসুল’ অনেক ফেরেস্তাই

আছে, যাদের সরদার হচ্ছে হযরত জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম যেমন মহান প্রভূর এরশাদ হচ্ছে جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة

(অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে পালর্ক বিশিষ্ট রসুল (বার্তাবাহক) বানায়েছেন।

আর "বা -ইখতিয়ার রসুল" হচ্ছেন হযরত আম্বিয়া -ই কিরাম। উদাহরণ নয় কেবল বুঝার জন্য বলছি যে, বাদশাহ এর প্রশাসনিক নির্দেশ ডাক যোগে গভর্ণর অথবা প্রধান মন্ত্রীর প্রতি প্রেরিত হয়ে থাকে, যাতে করে সেই নির্দেশ মাফিক জনসাধারণের উপর শাসন জারী করা হয়। পোষ্ট অফিসের কর্মচারী সেই সংবাদ রেজিষ্টারী আকারে গভর্ণর কিংবা প্রধান মন্ত্রীর বরাবরে পৌছিয়ে দেয়। অতঃপর এ সকল সম্মানিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে একত্রিত করে এ নির্দেশ ওদেরকে শুনায় এবং তাদের উপর জারী করেন, আইন লংগন কারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, আবার অনেককে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে পুরস্কারও প্রদান করেন। | দেখুন! ডাকঘরের কর্মচারীই ঐ সব কর্মকর্তাদের নিকট বাদশাহ্র সংবাদ নিয়ে যায় এবং সব কর্মকর্তারা জনসাধারণের কাছে বাদশাহের সংবাদ পৌছায়। কিন্তু উভয়ের সংবাদ পৌছানোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রথমোক্ত ব্যক্তি হচ্ছে ক্ষমতাহীন সংবাদবাহক,আর এ সব কর্মকর্তারা হচ্ছে ক্ষমতাবান অথচ কাজ উভয়ই একই করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন পদমর্যাদায় করেছেন। এ পার্থক্যের কারণে ফলাফল এটাই প্রকাশ হলো যে, প্রথমোক্ত কর্মচারীকে খাদেম বলা হয়, আর শেষোক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক বলা হয়। ঐসব কর্মকর্তাদের আনুগত্য বাদশাহের আনুগত্যের নামান্তর। তাদের নির্দেশাবলীর অমান্যতা বাদশাহের প্রতি বিদ্রোহ ধরে নেয়া হয়। ঐ সব কর্মকতাদেরকে প্রয়োজন বোধে জেল, ফাঁসী প্রদান করারও ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু পত্র বাহক পর্যায়ভূক্ত কর্মচারীর এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

এভাবে সংবাদ (ওহী) বাহক ফিরিশতাদেরকে সম্মানিত নবীগণের খাদিম হিসেবে ধরে নেয়া হয়। কোন ব্যক্তি ঐ সব ফেরেস্তাদের উম্মত হয় না এবং কোন ব্যক্তির উপর ঐ সব ফেরেস্তাদের কোন বিধি বিধান প্রয়োগ হয় না। ঐ সব ফেরেস্তাদের নাম কলেমায়ে সংযোযন হয় না বরঞ্চ ঐ সব ফেরেস্তারা সম্মানিত নবীগণের বিশিষ্ট খাদিম হিসেবে বিবেচিত হয়।

সম্মানিত আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্টির শাসক, মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্ষমতাবান হাকিম স্বরূপ। এ জন্যেই কওম বা জাতিকে তাদের উম্মত বলা হয়। তাদের নামের কালেমা পাঠ করতে হয়। তাদের বিধি-বিধান-সবার উপর প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন এর মধ্যকার পার্থক্যের কথা নিশ্চয় যেন স্মরণ থাকে। এই পর্যায়ের সম্মানিত আম্বিয়া-ই- কেরামও যদি ক্ষমতাহীন রসুল হয়, তাহলে রেসালত-ই-জিব্রাইলী এবং রেসালত-ই-মোহাম্মদী এর মধ্যে কি পার্থক্যটা হতো?

আর আমরা কলেমা-ই-তায়্যেবায় মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেন পড়ি? জিব্রাইল রসুলুল্লাহ কেন পড়ি না?

মুসলিম ও বোখারী শরীফের এক হাদিছে আছে যে, "হযরত ওমর (রা) বলেন একদা আমরা বারগাহে রেসালতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো, যার পোষাক সাদা আর চুল কালো ছিল, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে ইতিপুর্বে দেখিনি। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিটি মদিনার বাসিন্দা ছিল না। সে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সামনে দুজানু হয়ে হাঁটুর উপর হাত রেখে আদবের সাথে তশরিফ রাখলো যেমন নামাজী আত্তাহিয়াতে প্রভূর সামনে বসে। অতপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে পাঁচটি প্রশ্ন রাখে (১) ঈমান কি? (২) ইসলাম কি? (৩) ইহসান কি? (৪) কেয়ামত কখন হবে? (৫) কেয়ামতের আলামত কি? হুজুর ছৈয়্যদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আগন্তুকের প্রক্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক প্রত্যেক উত্তরান্তে স্বীকৃতি স্বরূপ বললেন সত্যিই বলেছেন, সত্যিই বলেছেন। অতপর চলে গেলেন। তৎপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইনি জিব্রাইল যিনি দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন।

দেখুন! জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম সাহাবা-ই-কিরামকে সম্বোধন করে বলেননি যে, ভাই সব, আমি জিব্রাইল। আমার নিকট হতে এ.সব মাসআলা শিখে নাও। বরঞ্চ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সামনে সাগরীদ সূলভ আত্তাহিয়াতের অনুরূপ বসলেন এবং সওয়াল পেশ করতঃ প্রিয় নবীর পাক জবানে ঐ সব মসআলা বয়ান করালেন, কিন্তু কেন?

এ জন্যেই যে, মানুষের উপর তার অনুসরণ এবং তার কথা মানা ওয়াজিব ছিল না বরঞ্চ দুজানু হয়ে বসে মুসলমানদেরকে বারগাহে নবুয়াতের আদব শিক্ষা দিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমি তোমাদের ন্যায় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই) খাদিম ও উম্মত। এটাই হচ্ছে বা- ইখতিয়ার রসুল এবং বে-ইখতিয়ার রসূলের মধ্যকার পার্থক্য। যারা আজ আম্বিয়া-ই-কেরামকে সম্পূর্ণ দুর্বল বান্দা, ক্ষমতাহীন পোষ্টম্যান এর ন্যায় শুধু সংবাদ বাহক স্বীকার করে এবং এভাবে কবিতা পড়ে থাকে ।

جن اداری

مصطفی ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے جبرائیل .

جبرائیل ہرگز نہ گفتے تانہ گفتمے کردگان

অর্থাৎ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কক্ষনো বলতেন না যদি জিবরাইল না বলতেন, এবং জিবরাইল কখনো বলতেন না যদি রব তায়ালা না বলতেন।

তারা জিব্রাইলের রেসালত এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রেসালতের মধ্যে কি পার্থক্যটা করবে? এবং এমতাবস্থায় তাদেরই অনুসরণই বা কি করে হবে? এবং মানব জাতি তাদের উম্মত কেন হবে? রেসালতের ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআন করীমের এরশাদ সমূহ পড়ে দেখুন- মহান রাব্বল আলামিন এরশাদ ফরমান

1) (ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

অর্থাৎ আমাদের নবী ঐ সব লোকদিগকে জাহেরী (বাহ্যিক) বাতেনী (আধ্যাত্মিকভাবে) পাক-পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব (কোরআন) ও হিকমত (পবিত্র হাদিস) শিক্ষা দেন।

প্রতীয়মান হলো যে, কেবল ক্ষমতাহীন বার্তা রাহক তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) ও শিক্ষা দান করতে পারে না। .

(2) خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها

মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি তাদের মালামালের ছদকাহ (যাকাত) আদায় করে নিন। এবং তাদেরকে ঐসব ছদকার দ্বারা জাহেরী (বাহ্যিক পবিত্র) ও তাযকিয়া (আধ্যাত্মিক পবিত্রতা) দান করুন।

3) (ترجى من تشاء منه وتؤوي إليك من تشاء

* আপনি আপনার বিবিদের মধ্য থেকে যাঁকে চান আপনার কাছে রাখুন, যাকে চান আপনার থেকে পৃথক রাখুন।

8) (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

انا

যখন আল্লাহ ও রসুল কোন বিষয়ে ফয়সালা দেন, তখন কোন মুসলিম নর-নারী " দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না। আরও বলা হয়েছে

5) فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا (يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تشليما)

- হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনারই প্রতিপালকের শপথ, এ লোক ততক্ষন মুমিন হতে পারে না, যতক্ষন আপনাকে নিজের তামাম ইখতিয়ারের একচ্ছত্র বিচারক স্বীকার করবে না এবং আপনার ফয়সালায় স্বীয় হৃদয়ে কোন রকমের সংসকীর্ণতার স্থান থাকে বরঞ্চ অবনত মস্তকে স্বীকার করবে।

ক্ষমতাহীন বার্তা বাহক বিচারক হতে পারে, না তার স্বীয় কউমের (গোত্রের) উপর এত বেশী ক্ষমতা রাখতে পারে।

রসুলের প্রয়োজনীয়তা

যদিও আল্লাহ তায়ালা গ্রীবাস্তিত ধমনী অপেক্ষা ও আমাদের নিকটতম (যেমন) এরশাদ ফরমান

نحن أقرب إليه من حبل الوريد

অর্থাৎ আমি তার কাছে শায়রগ আঁপেক্ষা অতি নিকটবর্তী। কিন্তু আমরা মহান প্রভূর অতি দূরে। এ প্রসঙ্গে শেখ সাদী (রাঃ) কত সুন্দর বলেছেন

يار نزديك تر از من بمن است

وی‌ں عجب ٥ی‌ں که من ازودے دورام

বন্ধু আমার অতি নিকটে কিন্তু এটা আশ্চর্য যে আমি তার থেকে অনেক দূরে।

মাধ্যম ছাড়া আমরা তারই নিকট হতে দয়ার ভাগী হতে পারি না। কারণ আমরাতো অন্ধকার, সে তো নূর, তিনি শক্তিশালী, আমরাতো দুর্বল। সে প্রভাবশালী, আমরাতো প্রভাবান্বিত। কাজেই প্রয়োজন ছিলো যে, রব ও পূজারী,আবেদ ও মাবুদ, খালেক ও মাখলুক, বান্দা ও প্রতিপালক, মোহতাজ (মুখাপেক্ষী) ও বে-নিয়াজ এর মধ্যে এমন বৃহত্তর মাধ্যম হওয়া চায়, তিনি প্রভূর থেকে ফয়েজ নিতে পারেন, এবং আমাদের দিতে পারেন। যেমন কলব (আত্মা) এবং দেহের সংযোগের জন্য মধ্যবর্তী রগ, শিরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কেননা এসব রগ কলবের ফয়েজ হাড় এবং মাংস পর্যন্ত পৌছায়ে থাকে। “রুহ” শরীরকে কলব ও আত্মা দ্বারা প্রতিপালিত করে থাকে। তাহলে আমাদের ন্যায় দূর্বল বান্দাদের পক্ষে বিনা মাধ্যমে প্রভূ থেকে ফয়েজ হাছিল করা ও ঐ পর্যন্ত পৌছা কি করে সম্ভবপর হবে? কারণ আমাদের এবং প্রভূর মধ্যবর্তী একটা মাধ্যম অতিশয় প্রয়োজন। ঐ মাধ্যমের নাম হচ্ছে রসুল আর ঐ উপায়ের নাম হচ্ছে রেসালত।

প্রত্যেক ব্যক্তি যারা রব পর্যন্ত পৌছতে চায়, অথবা, তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে চায়, তাদের রসুলের প্রয়োজন। বরঞ্চ যারা দুনিয়ার সংকট থেকে বাঁচতে চায়; তাদের জন্য নবীর দামন (আঁচল) ধরা একান্ত কর্তব্য। যেমন মহান প্রভূ এরশাদ করেছেন

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তায়ালার রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর, এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই বুঝে নিন যে, একটা গভীর কূপে স্বচ্ছ পানি রয়েছে এবং তলায় রয়েছে কাদা ও ময়লা। আমরা চাচ্ছি যে, যেন কূপে বালতি গিয়ে পানি নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। এবং বালতি কাদা-আবর্জনার পতিত না হয়। সে জন্য রশির মধ্যস্ততা গ্রহণ করা হয়। এর এক প্রান্ত নিজ হাতে থাকে অপর প্রান্ত বালতিতে বাধা থাকে। আর যদি রশি মোটা হয়, গিরা দেয়া যায় না; তখন এটাকে লোহার তার কিংবা চিকন রশি দ্বারা বালতির সাথে বাঁধা হয়। এমতাবস্থায় বালতি কূপে গিয়ে পানিসহ নিরাপদে উপরে উঠে, না কাঁদায় আটকে পড়ে, না তলায় রয়ে যায়।

দুনিয়াও একটা গভীর কূপ স্বরূপ যেখানে সঠিক আকিদা ও নেক আমলের স্বচ্ছ পরিস্কার পানির রয়েছে, যদ্বারা আখিরাতের চাষাবাদ সফল হয় এবং খারাপ আকিদা ও খারাপ আমলের আবর্জনাও আছে। আমরা বালতির ন্যায় এখানে নেক আমলের পানি গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। তাই প্রভূ ঘোষণা করেছেন

وما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون

অর্থাৎ আমি জ্বীন ও ইনসান (মানুষ)কে সৃজন করেনি কিন্তু ইবাদতের জন্যে।

বিধাতার ইচ্ছে ছিল যে, তার আত্মভোলা বান্দারা দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে যাতে আবদ্ধ না হয়ে ওখান থেকে নিরাপদে আমল ও আকিদার পানি নিয়ে আসে। তাই ঐ মেহেরবান, দয়াময় আল্লাহ এ বুযর্গ স্বত্বাকে পাঠালেন; যার এক হস্ত প্রভূর কুদরতের হাতে; আর অপরটি সৃষ্টির সাহায্য করার জন্য এদিকে ওদিকে রয়েছে। এরই নাম হাব লুল্লাহিল মতিন বা আল্লাহর মজবুত রশি।

যিনি আল্লাহ তায়ালার এ মজবুত রশিকে আঁকড়ে ধরেছে, উনি আল্লাহর সম্মানিত হস্তকে আঁকড়ে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে, সে (যেন) আল্লাহর তায়ালার বাইয়াত করে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।

অতপর স্বরণ থাকা চাই যে, যেমনিভাবে বালতিকে মোটা ও মজবুত রশি দ্বারা মধ্যস্থতাবিহীন আবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় বরং একে তার ও ছোট রশি দ্বারা আবদ্ধ করা হয়; তেমনিভাবে আমরাও সোজাসুজি হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দামানের সাথে আবদ্ধ হতে পরি না, কাজেই ঐ আবদ্ধতার জন্য বেলায়তের মজবুত তারের প্রয়োজন। আমাদের মশায়েখ (পীর) গণ আমাদেরকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌছান, আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছান।

ب ھیکا وہ سرکوڑ میں جوجانیں گر کو اور

ارب روٹھے گرمیل گررو ٹھے نںی ٹھور

এ অধমের এ তকরীর (বক্তব্য) থেকে রেচালতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো। অনুরূপভাবে, বেলায়তের প্রয়োজনীয়তাও। ওলী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছাবেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পৌছাবেন খোদা পর্যন্ত। পৌছানোর দায়িত্ব হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরই কাজ। গুজরাটবাসীদেরকে এক্কা গাড়ী, যত মূল্যবান হোক না কেন, করাচী পৌছাতে পারবেনা; কেবল ষ্টেশন

পর্যন্ত পৌছাতে পারবে। রেল করাচী পৌছাবে। . যখন এ ব্যাপারটা বুঝে নিলেন, তবে এটাও বুঝে নিন যে, আকিদায়ে রেসালতের জন্য তিনটি কথা স্বীকার করা অত্যাবশক। প্রথম এ যে, আমরা সোজাসুজিভাবে মহান প্রভূ থেকে কোন নেয়ামত নিতে পারিনা। যা কিছু মিলবে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উসীলায় মিলবে। অন্যথায় রেসালতের প্রয়োজনও থাকতো না এবং পৃথিবীতে রসুলের আগমন সম্পূর্ণ অনর্থক হতো যদি আমরা ডাইরেক্ট গ্রহীতা আর রব ডাইরেক্ট দাতা হতেন। রসুলের তাহলে প্রয়োজনীয়তা কেন??

দ্বিতীয়তঃ রসুল আমাদের মত কর্তৃত্বহীন নয়, তিনি রব' থেকে নিতে পারেনএবং আমাদেরকে দিতেও পারেন। যদি তিনি সোজাসুজিভাবে রব' থেকে নিতে সক্ষম না হন, তাহলে পুনরায় তাঁর জন্য আর একজন রসুল প্রেরণ করার প্রয়োজন হবে যার উম্মত তিনিই হতেন। আর যদি আমাদের দিতে সক্ষম না হন; তাহলে আমাদের জন্য অপর একজন রসুলের প্রয়োজন হয়ে পড়তো।

তৃতীয়তঃ রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দাতা রব'কেও জানেন এবং গ্রহীতা উম্মতদেরকেও চিনেন। এ দু'জ্ঞান ব্যতিত নেয়া আর দেয়া প্রমাণিত হয় না। যে সমস্ত লোক নবুয়াতের ওসীলা গ্রহণ করাকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, প্রত্যেক নেয়ামত মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত এটা মূলতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রেসালতকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং কালেমা-ই-তায়্যেবার দ্বিতীয়াংশের অস্বীকারকারী। কেননা যখন প্রত্যেক কিছু রব' থেকে আমরা নিজেই নিতে পারি; তখন তার আবার কি প্রয়োজন ছিল? নায়াজুবিল্লাহ মিনহু।

এ বক্তব্য থেকে আপনারা এটা বুঝে গেছেন যে, আল্লাহর সাথে রসূলের সম্পর্ক হচ্ছে আদায় করার আর আমাদের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে প্রদান করার। এজন্যই তাকে رسول الله রসুলুল্লাহও বলা হয় অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে গ্রহণকারী এবং আমরা তাঁকে رسولنا (আমাদের রসুল)ও বলি অর্থাৎ প্রদানকারী। উক্ত দুই সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর দু'টি কামালিয়াতের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। এ জন্যে কোরআন করীমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে رسول الله "রসুলুল্লাহ" এবং رسولكم "রসুলুকুম" বলা হয়েছে।

রসুলের মর্যাদা

পৃথিবীতে আমরা প্রভূ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি, অনুরূপ রসুলও। কিন্তু আমাদের আগমনকে কোরআন করীম খলক বা জন্ম বলেছেন যেমন এরশাদ হচ্ছে خلقكم و ما تعملون আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাদিকে সৃজন করেছেন। আরও বলা হয়েছে

و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون

আমি জ্বীন ও ইনসান (মানব)কে এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃজন করেছি।

আরও এরশাদ হয়েছে,

خلقكم والذين من قبلكم আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃজন করেছেন।

কিন্তু পৃথিবীতে রসুলের তশরীফ আনয়নকে বেছত (প্রেরণ) এবং রেছালত দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যেমন এরশাদ হচ্ছে

هو الذي بعث في الأميين رسولا

আল্লাহ তিনিই; যিনি মুর্খদের মাঝে রসুল প্রেরণ করেছেন।আরও এরশাদ হচ্ছে

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق

আল্লাহ হচ্ছে তিনিই, যিনি আপন রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মোট কথা বেছত' এবং রেছালত' শব্দদ্বয়ে শুধুমাত্র নবীদের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের বেলায় নয়। অর্থাৎ আমরা হলাম আল্লাহর কেবলমাত্র মখলুক, আর রসুল তার মখলুকও, "রসুল"ও এবং তাঁর প্রেরিতও বটে।

এ পার্থক্যের কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ আমরা পৃথিবীতে আপন আপন কাজ-কর্মের জন্যে নিজ জিম্মায় আগমন করি আর রসুল পৃথিবীতে তশরীফ আনেন প্রভূর কাজ-কর্মের উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রভূর জিম্মায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন দেশে কেউ নিজ কাজ-কর্মের জন্যে যায়, আর কেউ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের জন্যে রাষ্ট্রের তত্বাবধানে যায়। নিশ্চয় উভয়ের যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির বেলায় যাতায়াতের সমস্ত খরচাদি তার রাষ্ট্রেরই জিম্মায় থাকে, এবং তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে নিজ জিম্মায় ভ্রমণকারীর বেলায় তা নয়।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এসেছি পৃথিবীতে নিজেকে গঠন করার জন্যে। যেমন, বিশুদ্ধ আকিদা অবলম্বন করতঃ মুমিন হই, নেক আমল করে মুত্তাকী পরহেজগার হই, কিন্তু রসুল তশরীফ এনেছেন অন্যদের গঠন করার জন্যে যেমন মানব সমাজ তাদের মাধ্যমে মুত্বাকী-পরহেজগর হয়। ইসলামের জাহাজে আমরা যেমন যাত্রী, রসুলও তাই। কিন্তু, আমরা বন্দরে পৌছার জন্যে আর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বন্দরে পৌছানোর জন্যে। উদাহরণ স্বরূপ জাহাজে যাত্রীও উঠে কাপ্তানও উঠে এবং যদিওবা জাহাজে সমুদ্র যাত্রার শুরু আর শেষ উভয়ের একই হয়, কিন্তু যাত্রী জাহাজে সওয়ার হয়েছে বন্দরে পৌছার জন্যে, আর কাপ্তান হয়েছে বন্দরে পৌছিয়ে দেয়ার জন্যে। এ পার্থক্যের কারণে যাত্রী বাড়া দিয়ে সওয়ার হয় আর কাপ্তান মাসিক বেতন নিয়ে।

তৃতীয়তঃ আমরা সাধারণ লোক পৃথিবীতে নিবোধ অবস্থায় জন্ম লাভ করি। এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করি। আর ঐসব হযরত সব কিছু প্রভূ কর্তৃক শিক্ষা গ্রহন করে অন্যদের শিক্ষা দানের জন্যে তশরীফ আনেন। এ কারণে আমরা এখানের সামাজিক পরিবেশ গঠিত হই। কিন্তু রসুলগণ কালিমাপূর্ণ সমাজে আর্বিভূত হয়ে পবিত্র থাকেন অথাৎ পরিবেশ আমাদেরকে পরিবর্তন করে আর তাঁরা পরিবেশকে পরিবর্তন করেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই এরশাদ করলেন

أتاني الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلوة والركوة مادمت حيا وبرا بوالدتي

আমি আল্লাহর বান্দা আমাকে তিনি কিতাব (ইঞ্জিন) দান করেছেন, আমাকে নবী বানিয়েছেন এবং আমাকে বরকতময়ী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে নামাজ ও পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকি এবং আমাকে আপন মায়ের সাথে সৎ ব্যবহারকারী করেছেন।

উক্ত আয়াতে করীমার সব স্থানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ সব কিছু শিখে, জেনে এখানে এসেছি। এটাই হচ্ছে রসুলের শান বা মর্যাদা। আমাদের হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জন্মগত আরিফ বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন কামেল রসূল ছিলেন। বাল্য জীবনে ধাত্রী মাতা বিবি হালিমার তত্বাবধানে থাকাকালে যখন সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেরা তাঁকে খেলার জন্যে আহবান করে, তখনই তিনি এতো স্বল্প

বয়সেও পবিত্র জবান দ্বারা ফরমালেন “আমাকে এ কাজের জন্যে প্রেরণ করা হয়নি"- এটাই হচ্ছে রসূলের প্রকৃতি, এটাই হচ্ছে পৃথিবীতে রসূলের আগমনের শান ও মর্যাদা।

⭕⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅

যে সব লোক রসূলগণকে নিজেদের মত সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানহীন কিংবা নবুয়াত প্রকাশের পূর্বে পথ ভ্রষ্ট ও ধর্মহীন মনে করে, ঐ সব লোক মূলতঃ রসুলের মর্যাদার অস্বীকারকারী। রসুল যদি আমাদের মতো সংশোধনের মুখাপেক্ষী হতেন; তাহলে তাঁর জন্য অন্য একজন রসুলের প্রয়োজন হতো, যিনি তাঁকে সংশোধন করতেন আর যার উম্মত হতেন খোদ তিনি।

উল্লেখ্য যে, সর্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তিই সফলকাম যিনি পুতঃ পবিত্র অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে এবং আল্লাহর জিকির করে এবং নামাজের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করে।

কোরআন শরীফে এরশাদ হচ্ছেঃ

قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی

“নিঃসন্দেহে, কামিয়াব হয়েছে সেই, যিনি পাক-পবিত্র হয়েছে এবং যিনি স্বীয় প্রভূর বরকতময় নাম জিকির করেন এবং নামাজ পড়েন।"বুঝা গেল যে, পুত-পবিত্রতা হচ্ছে কামেয়াবীর প্রথম সোপান। প্রশ্ন হচ্ছে, পবিত্রতা দানকারী কে?

এ প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে এরশাদ হচ্ছে

ویزکیهم و یعلهم الکتب و الحکم

আমার নবী ঐ সমস্ত লোকদেরকে পাক-পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হেকমত শিখান।” আরও এরশাদ হচ্ছে-

جذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها

আপনি তাদের ছদকাহ সমূহ’ গ্রহণ করুন। এর বিনিময়ে আপনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করুন।

বুঝা গেল যে, পবিত্রতা অর্জনকারী হলাম আমরা আর পবিত্রতাদানকারী হলেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) । আমাদের মধ্যে চারটি বস্তু রয়েছে, শরীর, মস্তিষ্ক, চিন্তা ও রূহ (আত্মা)। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও আমাদের চারটি জিনিস দান করেছেন “শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারেফত”। শরীয়ত দ্বারা আমাদেরকে শরীরকে পাক করেছেন, তরীকত দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনাকে পবিত্রতা দান করেছেন, হাকিকত দ্বারা অন্তরকে আর মারেফত দ্বারা রূহ বা আত্মাকে পাক পবিত্র করেছেন।

এটাও জানা থাকা চাই যে, শরীয়তের কেন্দ্র হলো প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারক, তরীকতের কেন্দ্র হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অন্তর মুবারক। হাকিকতের প্রস্রবনের অগ্রভাগ হলো রূহে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং মারেফতের কেন্দ্রও নবুয়াতের রহস্য। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে চার ধরনের কালিমা দূরীভূত করার জন্যে চার প্রকারের পানি দান করেছেন। বাকী রইলো, আমাদের নাফসে আম্মার। এটাকে পাক ও পবিত্র করার জন্যে ‘ইশকে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বা মুহাব্বতের আগুণ দান করেছেন, যদ্বারা নাফসকে ভষ্ম করতঃ তার হাকীকত বদলায়ে দেয় এবং পরিবর্তিত হাকীকত নাপাককে পাক করে দেয়।

যা হোক সৃষ্টির কাছে রসুলের এতবেশী প্রয়োজন, যেমন জমির জন্য পানি, বাগানের জন্যে বৃষ্টি। জমির কোন অংশই কখনো বৃষ্টি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি সে যেই স্তর বা পজিশনের হোক না কেন হায়াত-মাউত, কবর নশরের বেলায় কখনো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে উদাসীন হতে পারে না। যেমন বাগানের প্রতিটি পাপড়ি, ফুল কুড়ি গুল্ম বৃষ্টির কাছে ঋণী তেমনি মখলুকের চরম উৎসর্কতা বারগাহে নবুয়াতের মেহেরবাণী। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রভূর কসম,যার যা মিলেছে, সবই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দয়ার কারণে মিলেছে। খোদার দরবারে প্রার্থনা, আমাদের সবাইকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অনুগ্রহের বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত করুন, আমিন।

একটি সংশয়

আমার এ বক্তব্যের উপর কোন কোন হযরতের মনে একটি শংসয় জন্ম নিতে পারে যে, যখন রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমবিহীন মহান আল্লাহর কাছ থেকে সব কিছু লাভ করতে পারেন, তারপরও তাঁর এবং প্রভূর মধ্যখানে হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যস্থতা কেন রাখা হলো? এবং ওহী প্রেরণের সিলসিলা কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো? মহান প্রভূ এরশাদ করেন

جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة

আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদেরকে পাখা বিশিষ্ট বাহক বানিয়েছেন।

আর এরশাদ হচ্ছে- نزله روح القدس على قلبك

হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এ কোরআন আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করেন।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা বুঝা যায় যে, যেমনি ভাবে আমরা মাধ্যমবিহীন প্রভুর কাছ থেকে কিছু লাভ করতে অক্ষম; তেমনিভাবে, রসুলও মাধ্যম বিহীন তার (প্রভূ) কাছ থেকে কিছু লাভ করতে অক্ষম। ঐ সব রসুল অপর একজন রসূলের প্রয়োজনীয়তা মনে করে, যাকে শরীয়তের ভাষায় “রুহুল কুদুস বা জিব্রাইল বলা হয়। এ সব কারণে কোরআন করীম হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তথা তার সাহায্য কারীদের রসুল আখ্যা দিয়েছেন।

সংশয়ের অবসান

উক্ত আপত্তির উত্তর হচ্ছে, ওহীর আগমন এবং জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে আসা একটা কানুনের অনুসরণ মাত্র, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ইলমের জন্য নয়। মহান আল্লাহ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে প্রথমেই সব কিছু শিক্ষা দিক্ষা দান করেই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু প্রভূর নিয়মাবলী বান্দাদের মধ্যে প্রচলন ঐ সময় হবে; যখন ওহীর মাধ্যমে ঐ সব কানুন অবতীর্ণ করা হবে। এর পিছনে কয়েকটি দলিল রয়েছে।

প্রথমতঃ রাব্বল আলামীন কোরআন করীমের প্রশংশী এভাবে করেছেন هدى للمتقين

এ কোরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক স্বরূপ। অর্থাৎ হে মাহবুব! তোমার পথ প্রদর্শক নয় তুমি তো প্রথম থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত। এজন্য هدى لك (আপনার হেদায়ত) বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সিলসিলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চল্লিশ বৎসর বয়সের পর আরম্ভ হয়। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চল্লিশ বৎসরের জিন্দেগীটা ছিল সততা, বিশ্বস্ততা,

সত্যবাদিতা ও সরলতার অতি উত্তম দৃষ্টান্ত। ফলে কাফিররাও তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল-আমীন (সত্যবাদী), সাদেকুল ওয়াদ (অঙ্গীকার রক্ষাকারী) খেতাব দিয়েছিল।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হেদায়াত প্রাপ্তি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর যদি নির্ভরশীল, তা হলে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ বৎসরের জিন্দেগীটা আসে পাশের অন্যান্য সাধারণ আরবদের ন্যায় অতিবাহিত হতো। অথচ হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উক্ত দীর্ঘ সময়ে শিরক ও কুফর তো দূরের কথা বরং কখনো খেলাধুলা, আমাদে-প্রমোদ, গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ভিন্ন) নামের উপর জবেহ কৃত পশুর মাংস খাননি। বলুন এ হেদায়াত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোন্ ফেরেস্তা কিংবা ওহীর মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন?

তৃতীয়তঃ যখন প্রথম ওহী নাযিল হয়, তখন ছরকারে দোজাহান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হেরা পর্বতের গুহায় ছয় মাস পর্যন্ত ইতেকাফ, নামাজ, সিজদা, রুকু ইত্যাদি ইবাদাত সমূহে মশগুল ছিলেন। চিন্তা করুণ, ঐ সময় হুযুর এ সব ইবাদাত সমূহ কোথা থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন?

চতুর্থঃ স্মর্তব্য যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নামাজের তোহফা মিরাজরজনীতে লামাকানে পৌছে লাভ করেন। মিরাজের ভোরবেলায় ফজরের নামাজ পড়ানো হয়নি। জোহর থেকে আরম্ভ করে পরস্পর দুই দিন পর্যন্ত জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন আর এ দিকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ পড়াইতেছেন। তখন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রচলন হয়। কিন্তু চিন্তার বিষয় যে, মিরাজরজনী ফরশ (পৃথিবী) থেকে আরশের অভিমুখে সফরকালে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বাইতুল মোকাদ্দাসে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে নামাজ আদায় করেন। তিনি ইমাম হলেন আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মুকতাদী। এদের মধ্যে আবার কেউ মুয়াজ্জিন কেউ মোকাব্বের। চিন্তা করুন, এটা এমন মুবারক সময় এদিকে নামাজ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। অথচ দেখুন, এরই পূর্বে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নামাজ পড়ায়ে গমন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। যাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন, তাঁরা হলেন সম্মানিত নবীগণ যাঁরা স্বীয় উম্মতদেরকে নামাজ পড়াতেন, এবং শিখাতেন। এ থেকে এ মসআলাটা হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই যে, নামাজের ইমাম শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাজ সংক্রান্ত মসআলা-মসায়েল সম্পর্কে মুক্তাদীদের থেকে অধিকতর পরিপক্ষ হওয়া বাঞ্চনীয়।

পঞ্চমতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে সবসময় অহী নাজিল হতো না। প্রায় সময় বিনা মাধ্যমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ওহী হতো। মহান প্রভূ বলেন

وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى

আমার মাহবুব “স্বীয় অভিলাষ মতে কথা বলেন না, যা বলেন, তা সব প্রভূর ওহী মাত্র, যা কিছু তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়।”

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বিষয়ে জিব্রাইল আমীন ওহী নিয়ে আসতেন না। আরও এরশাদ হচ্ছে-

ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى إلى عبده ما اوحى

তারপর, আমার মাহবুব, নিকট থেকে আরও নিকটতর হন,' যেমন দু'টি কামানের মুখামুখি। প্রভূ স্বীয় বান্দাকে যা ওহী দিতে চেয়েছেন, তা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, এ নৈকট্যের বিশেষ সময় বিশেষ ওহীই করা হয়েছে। জিব্রাইলের কল্পনা সেখানে পৌছার কোন অবকাশ নেই।

غنچه ما اوحی کے وہ چٹکے دنی کے باغ میں

بلبل سدره تك ان كی بو سے بھی محرم نہیں

যাই হোক এটা মানতে হবে যে, রাব্বল আলামীন ও তার মাহবুবের মাঝে জিব্রাইলের আনাগোনা এবং ওহীর পরম্পরা নিয়মতান্ত্রিতার প্রতিফলন মাত্র। এ নিয়ম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে জ্ঞানদান করার জন্য নয়। নতুবা আমরা যেমন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হই, অনুরূপ, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিব্রাইল আমিনের উম্মত হতেন। এবং আমরা যেরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কালেমা পাঠ করি, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে। ওয়া সাল্লাম) ও জিব্রাইলের কলেমা পাঠ করতেন।

নবীঃ এ বিষয়ে দু'টি অংশ আছে, একেতঃ সুমহান ইসলামের নবুয়তের মর্যাদা। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের মহান নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অবস্থান। তাই মুক্তির পূর্বশর্ত তৌহিদ নয়, বরং ঈমান। আর ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বত। ফলাফল দাঁড়ায় যে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমই মুক্তির পূর্বশর্ত। এর পিছনে অনেক দলিলাদি রয়েছে।

প্রথমতঃ শয়তান খোদার জাত-সিপাত বেহেস্ত দোযখ, হাশর-নশর, অদৃষ্ট ও ফিরিস্তা ইত্যাদি সবকিছুর বিশ্বাসী ছিল কিন্তু মুক্তি পায়নি। স্বয়ং নিজেই বলছেঃ

ولعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين

আপনার ইজ্জতের কসম, আমি সমস্ত আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করবো, আপনার একান্ত বান্দাদের ব্যতিত। বুঝা গেল যে, প্রভূর জাত ও সিফাত সম্পর্কে সে বিশ্বাসী ছিল। ওটাও জানতো যে, প্রভূর একান্ত বান্দারা এসব বিষয় সমূহে খুবই দক্ষ অর্থাৎ তকদীরের (অদৃষ্ট) বিশ্বাসী।

সে আরও বলছে-

انظرنی إلی يوم يبعثون

মাওলা! আমাকে পুনরুত্তান দিবস পর্যন্ত সময় দিন। বুঝা গেল যে, (সে) কিয়ামত তথা কিয়ামতের অবস্থাদি জানতে ও মানতো।

তখন প্রভূ এরশাদ করলেন

لاملئن جهنم ممن تبعك

আমি তোমার অনুসারীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। এতে জানা যায়, সে বেহেস্ত দোযখ সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিল। বস্তুতঃ ঈমানের সকল দিক সমূহ মানতো, অস্বীকারকারী ছিল কেবল নবুয়াতের। এ জন্য অভিশপ্ত হলো। নবুয়াত হচ্ছে, যেমন শত বা হাজার টাকার নোট, এ নোট যখন সরকারী অনুমোদিত হয় তখন একটা কাগজের মূল্য একশত বা একহাজার টাকা হয় কিন্তু সরকারী সম্পর্কহীন এসব কাগজের কোন মূল্য নেই। অনুরূপ কিয়ামতের মাঠে তৌহিদের মূল্য তখনই হবে, যখন তা নবুয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

দ্বিতীয়তঃ কালেমা-ই-তায়্যেবার নাম হচ্ছে কালেমা-ই- তৌহিদ (একত্ববাদের স্বীকারোক্তি)। কিন্তু এর দু'টি অংশ রয়েছে, প্রথমাংশের রয়েছে তৌহিদের উল্লেখ এবং দ্বিতীয়াংশে নবুয়তের। সুতরাং চিন্তা করুন, নামে কলেমা-ই-তৌহিদ, আর এতে

উল্লেখিত হয়েছে দুটি বিষয়ের। যেমন প্রথমাংশে রয়েছ তৌহিদের কাগজের উল্লেখ, আর দ্বিতীয়াংশে এর সরকারী মোহরের, ফলশ্রুতিতে তৌহিদে ঈমানী তৌহিদে নববীতে রূপান্তরিত হলো।

কেবল তৌহিদই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতো, তাহলে উক্ত কলেমাই তায়্যেবায় এ দ্বিতীয় অংশটা নিঃসন্দেহে অর্থহীন হতো।

তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ কোরআন করীমে আমাদেরকে তৌহিদী জনতা বলেননি বরং আমাদের পুরুষদের মোমেনিন আর মহিলাদের মোমেনাত খেতাব দিয়েছেন। তৌহিদবাদী বলে কোথাও সম্বোধন করেনি। কেবল তৌহিদ যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতো, তাহলে কোথাও না কোথাও এই খেতাবটা অবশ্যই দেখা যেতো।

চতুর্থঃ মুসলিম ভিন্ন আরও অনেক জাতি রয়েছে, যারাও তৌহিদের দাবীদার যেমন, শিখ, আ'রীয়া, এবং কতেক খৃষ্টানও। কিন্তু এদের মুসলিম বলা যাবে না এবং তাদের জন্য মুক্তির কোন সম্ভাবনাও নেই। কেননা নবুয়তকে ইন্কার করেছে। তৌহিদকে নবুয়তের দর্পনে দেখুন, কা'বা মোয়াজ্জমার প্রতিকৃতিও সবুজ গুম্বদের চারদিকের ঝালির জানালা দিয়ে দেখুন, তখনই মুমিন হতে পারবে।

পঞ্চমতঃ হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক আসমানী ধর্ম এসেছে, এবং ঐ সবকে পৃথক পৃথক ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে এজন্য নয় যে, ঐ সব ধর্মে তৌহিদ প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ছিল। আবার এটাও নয় যে, ঐ সব ধর্ম সমূহে হাশর-নশর, বেহেস্ত দোযখ ইত্যাদির বিশ্বাস নিয়ে মতভেদ ছিল, এটাও নয় যে, সেসব ধর্ম সমূহে বেহেস্ত দোযখের ফিরিস্তা কিংবা তাকদীর সম্পর্কীয় মাসআলা স্বীকার করার মধ্যে মতান্তর ছিল। প্রত্যেক ধর্মই ঐ সব বিষয় সম্পর্কে একই বিশ্বাস পোষণ করতো, তথাপি মতান্তর ছিল। কারণ, তাদের নবুয়ত ভিন্ন এবং নবী আলাইহিস সালাম পৃথক ছিলেন। মূছায়ী ধর্ম এক ধরণের ছিল এবং ইসায়ী ধর্ম ছিল অন্য ধরণের। এ জন্য যে, মূছায়ী ধর্মের নবী ছিলেন হযরত মূছা আলাইহিস সালাম। আর ইসায়ী ধর্মে ঈসা আলাইহিস সালাম। এতে বুঝা গেল যে, ধর্ম প্রবর্তিত হয় নবুয়ত দ্বারা। কেবল তৌহিদ ও দীনকে প্রভূ কখনো পৃথিবীতে পাঠাননি।

ষষ্ঠতঃ যেহেতু কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির কাছে তৌহিদ ও ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর নবুয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়

ما كنت تقول في حق هذا الرجل

(তুমি এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে?)।

যদি কেবল তৌহিদের বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো; তাহলে প্রথম উত্তরের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হতো।

উপরোক্ত দলিলাদি থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুক্তির নির্ভরতা কেবল তৌহিদের বিশ্বাসের উপর নয়, বরং ঈমানের উপর। আর ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে নবুয়তের উপর। যে সব মৃত দেহ দাফন করা হয়নি, যেমন, বাঘে খেয়ে ফেলেছে কিংবা পানিতে ডুবে বা আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে অথবা দীর্ঘ কাল ধরে লাশ পড়ে আছে, ঐ সব থেকেও ঐ সব প্রশ্ন এবং প্রশ্নের পর প্রতিকার প্রদান করা হবে।

কিন্তু এটা কেবল রূহ এর উপর, যা কেউ অনুভব করতে পারেন না। মাতৃগর্ভে ফিরিস্তা গমন করতঃ সবকিছু লিখে নেয়, কিন্তু মা'র খবর হয়না। উপরোক্ত দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুক্তির নির্ভরতা কেবল তৌহিদের বিশ্বাসের উপর নয়, বরং ঈমানের উপর। আর ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে নবুয়তের উপর।

সূক্ষ্ম তত্বঃ এ আলোচনা প্রসঙ্গে যখন কবরে প্রশ্নোত্তরের কথা এসেছে, তাহলে একটি ঈমান উদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ কথাও শুনে নিন, মুনকির-নকির ফেরেস্তা কবরে মৃতদেরকে তিনটি প্রশ্ন করেনঃ

১। তোমার প্রভূ কে? বান্দা বলেন, আল্লাহ।

২। তোমার ধর্ম কি? মুমিন বান্দা বলেন, ইসলাম।

৩। তুমি এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কি বল? মুমিন বান্দা বলেন, আল্লাহর প্রেরিত সত্য রসুল।

কিন্তু প্রশ্নের নিয়মে পার্থক্য রয়েছে। তৌহিদ ও ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার বেলায় এই শব্দটা নেই কিন্তু নবুয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করার বেলায় "এই" শব্দটা রয়েছে। অর্থাৎ যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমার প্রভূ কে? তোমার ধর্ম কি? কিন্তু তোমার নবী কে, বলা হয়নি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, প্রশ্ন হচ্ছে তিনটি, আর নিয়ম দুইটি। পার্থক্যের কারণ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ আর ধর্ম মৃতকে দেখানো হয়নি।তাই "এই" শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়নি। আর হুযুর মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জামাল কে দেখায়ে বলা হয়-দেখ, ঐ মনোরম চেহেরাদারী, কালো জুলফি বিশিষ্ট লোকটি কে? এবং জীবিত কালে কি বলতে তাঁকে তুমি? ভাই বলতে, না আকা, নিজের মতো বলতে, না বে-মেছাল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলতে? ..

দু'টি আপত্তি

আপত্তি নং ১ একই সময়, বিভিন্ন স্থানে সহস্রাধিক মৃত ব্যক্তি দাফন হয়। এবং একই সময় একই মুহূর্তে ঐ সহস্রাধিক স্থানে কবরে প্রশ্নোত্তর হয়ে থাকে। একটি জামাল (সৌন্দর্য) এতসব স্থানে একই সময় কিভাবে দেখানো সম্ভবপর হয়?

উত্তরঃ একটি সূর্য একই সময় সহস্রাধিক স্থানে দেখা যেতে পারে। এবং সব জায়গায় ইংগিত করে বলা হয় যে, এটা সূর্য। এমনকি সহস্রাধিক স্থানে যদি লক্ষ আয়েনাকে একই সময় সূর্যের প্রতি ধরা যায়, তাহলে ঐ একটি সূর্য উক্ত সব আয়েনাতে স্বীয় তাপ, তীক্ষ্ণতা, ও উজ্জ্বল্যতা প্রদান করে। এটা তো আসমানী উদাহরণ । আজকের বিজ্ঞানী অবদান টেলিভিশন উক্ত মসআলাটা আরও সহজ কে দিয়েছে যে, একজন ব্যক্তি একই সময় প্রত্যেক জায়গায় দেখা যেতে পারে এবং এর আওয়াজ লক্ষ স্থানে শুনা যায়। আগুনের যখন এ শক্তি, তখন নূরের শক্তি সম্পর্কে কি আর আপত্তি করার আছে।

আপত্তি নং ২ আমরা মুসলমান, জীবনে কখনো জামালে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) (নবীর মুবারক চেহারা) দর্শন ভালে সমর্থ হয়নি, কবরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে কিভাবে চিনতে পারব? পক্ষান্তরে, আবু জাহেল প্রমুখ মক্কার কাফিরেরা যারা সারাটা জীবন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখে ছিল, তারা কেন চিতে সক্ষম হবে না।

উত্তরঃ দুনিয়াবী সম্পর্কের বেলায় পরিচয়টা দেখাশুণায় হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মিক ও ঈমানী সম্পর্কের বেলায় পরিচয় লাভ বাহ্যিক দর্শনের উপর নির্ভর নয়। জীবনে যাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে; তাঁরা অবশ্যই চিনতে পারবেন, যদিওবা কখনো দেখেননি, পক্ষান্তরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাদের সম্পর্ক বর্তমান নেই, তারা কখনো তাকে চিনতে পারবে না, যদিওবা তারা মৃত্যু অবধি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেয়েছিল । কোন কোন ভাগ্যমান লোকেরা স্বপ্নে আর কোন কোন কামেল ব্যক্তি কাশফের মাধ্যমে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দর্শন লাভ করেন এবং দেখা মাত্রই চিনতে পেয়ে উৎসর্গীত হয়ে যান।

যাহোক এ মাসআলাটা একবারেই সুস্পষ্ট। তথাপি কতেক লোকের ধারণা হচ্ছে। যে,هذا(এই) শব্দটা স্মৃতিপটের প্রতি ইংগিত করাই উদ্দেশ্য, বাস্তব ইংগিত নয়। অর্থাৎ মৃতদেরকে জামালে মোস্তাফা দেখানো হয় না বরং এদের জিজ্ঞাসা করা হয়; ঐ ব্যক্তিটা কে, যিনি তোমার স্মৃতি পটে আছে? কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে ভুল ধারণা।

কারণঃ

প্রথমতঃ অন্তরেতো ধর্মও বর্তমান ছিল, আল্লাহর তা'আলা সম্পর্কে মৃতব্যক্তি অবহিতও ছিল, তথাপি ঐ দুইয়ের বেলায় । শব্দটি দ্বারা কোন প্রতিস্মরণ মূলক ইংগিত করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ কাফির হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকে। যদি কোন জামাল (সুন্দর আকৃতি) তার দৃষ্টির সামনে না হতো, তাহলে সে প্রশ্ন করা মাত্রই বলতো-কার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করছেন? কিন্তু তারা এরূপ বলে না, বরং বলে, আমি তাকে চিনি না। বুঝা গেল যে, কোন সুন্দর আকৃতি তার সামনে রয়েছে, যা সে দেখছে কিন্তু চিনতে পারছে না।কতেক লোকদের ধারণা যে, ফেরেস্তারা মৃতদেরকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে। ওয়া সাল্লাম) এর ছবি দেখান কিন্তু এটা বাতিল। কারণ, ছবিটা না ব্যক্তি হয়, না নবী। ঐ ছবিকে ব্যক্তি বলা ভুল হবে আর নবী বলা কুফরী হবে। তদুপুরি সর্বত্র দেখানো ছবিটা যদি একটিই হয় তাহলে আবার ঐ প্রশ্নটাই সৃষ্টি হবে যে, একটি ছবি, একই সময় লক্ষ স্থানে কিভাবে দেখা যায়। উপরন্তু যদি ছবি একাধিক হয়, তাও হবে ভুল। কেননা প্রশ্ন কর্তা ফেরেস্তা হলেন ওনারাই।যা হোক, এ কথা নিশ্চিত যে, মুক্তির নির্ভরতা তৌহিদের উপর নয় বরং ঈমানের উপর আর ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে নবুয়তের উপর।

আল্লাহ সবাই কে বুঝতে সাহায্য কর। আমীন।